পুরাতত্ত্ব পরিচিতি

সি. শিবরামমূর্তি

ভারতীয় সংগ্রহশালা
কলিকাতা

প্রথম ইংরাজী সংস্করণ (১৯৫৪)
প্রথম বাংলা সংস্করণ (১৯৬৫)

অনুবাদ
মনিরা খাতুন

ট্রাস্টি বোর্ড, ভারতীয় সংগ্রহশালা কর্তৃক প্রকাশিত ও
রেস্ প্রিণ্টারী, কলিকাতা-১২ দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

ভারতীয় সংগ্রহশালার পুরাবস্তু সংগ্রহটি সম্ভবতঃ প্রাচ্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ সংগ্রহ। পুরাবস্তু কক্ষগুলির একটি সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র নির্দেশিকার অভাব সংগ্রহশালার দর্শকসাধারণ বহুদিন হইতে বোধ করিতেছেন। সংগ্রহশালার অছি-পরিষদ বিভিন্ন বিভাগের নির্দেশিকা, ছবির পোষ্টকার্ড এবং পুস্তিকা রচনার দায়িত্বভার লইয়াছেন। বর্তমান নির্দেশিকার প্রকাশন এই নিয়মিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অন্তর্গত।

এই নির্দেশিকাটি প্রদর্শিত পুরাবস্তুগুলির বিরাট সংগ্রহের সম্পূর্ণ বা ব্যাপক তালিকা নহে; বিশদ বিবরণে প্রবৃত্ত না হইয়া শুধুমাত্র অধিকতর উল্লেখযোগ্য বস্তুগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পুরাবস্তুগুলি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়ার জন্য রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। যাঁহারা অধিক অধ্যয়ন করিতে চান, তাঁহারা গ্রন্থপঞ্জীতে প্রদত্ত পুস্তক ও তালিকাগুলি দেখিলে লাভবান হইবেন। নবগঠিত দেব প্রতিমার ক্রমবিকাশ এবং লেখবিষয়ক কক্ষগুলি হইতে দর্শক যাহা শিক্ষা করিবেন, এখানে নাগরী ও বাংলা লিপির ক্রমবিকাশের তালিকা দুইটিতে তাহারই সামান্য নমুনা দেওয়া হইয়াছে। দর্শকগণ যাহাতে বস্তুগুলিকে তাহাদের যথাযথ ভৌগলিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া বুঝিতে পারেন, সেইজন্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক এবং আদি-ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলি এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলিসহ একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আশা করা যায়, এই নির্দেশিকাটি এবং ছবির যে পোষ্টকার্ডগুলি প্রকাশিত হইবে, সেগুলি বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ করিবে।

এই সংগ্রহশালার পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বিদ্বান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবরামমূর্তি এই ব্যবহারযোগ্য পুস্তিকাটি রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা আগ্রহী দর্শকসাধারণের পক্ষে একাধারে সংক্ষিপ্ত ও শিক্ষাপ্রদ ভূমিকা স্বরূপ।

যদিও এই নির্দেশিকায় অনেকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, তথাপি ইহার মূল্য পরিমিত করিয়া ইহাকে সহজলভ্য করা হইয়াছে।

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি
অছি-পরিষদ
ভারতীয় সংগ্রহশালা

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩

—সূচিপত্র—

চিত্র পরিচিতি

১ নং চিত্র : (ক) রামপুর্বায় প্রাপ্ত সিংহশীর্ষ, মৌর্য, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক—প্রবেশ কক্ষ।

(খ) পাটনায় প্রাপ্ত যক্ষ, মৌর্য, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক—প্রবেশ কক্ষ।

(গ) বেসনগরে প্রাপ্ত যক্ষিণী, শুঙ্গ, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক—প্রবেশ কক্ষ।

(ঘ) ভারহুত স্তূপ-বেষ্টনীতে খোদিত সিরিমা দেবতা, শুঙ্গ, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক—ভারহুত কক্ষ।

২ নং চিত্র : (ক) অমরাবতীর স্তূপ-বেষ্টনীর উষ্ণীষে খোদিত মায়াদেবীর স্বপ্ন, সাতবাহন, ২য় শতক—গুপ্ত কক্ষ।

(খ) ভারহুত স্তূপের তোরণ, শুঙ্গ, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক—ভারহুত কক্ষ।

৩ নং চিত্র : (ক) বোধিসত্ত্ব, গান্ধার, খ্রীঃ ১ম শতক—গান্ধার কক্ষ।

(খ) দ্বারপাল, ভূমারা, গুপ্ত, খ্রীঃ ৫ম শতক—গুপ্ত কক্ষ।

(গ) প্রভামণ্ডল-শোভিত বুদ্ধ, মথুরা, গুপ্ত, খ্রীঃ ৫ম শতক—গুপ্ত কক্ষ।

(ঘ) শুকপাখীসহ যক্ষিণী, মথুরা, কুষাণ, খ্রীঃ ২য় শতক—গুপ্ত কক্ষ।

৪ নং চিত্র : (ক) মা ও শিশু, বঙ্গদেশ, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১১শ শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

(খ) রতি ও প্রীতিসহ মন্মথ, বিহার, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১০ম শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

(গ) হরগৌরী, উত্তর প্রদেশ, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১০ম শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

৫ নং চিত্র ঃ (ক) প্রেমপত্র রচনারতা নারী—অঙ্গের নখক্ষত এরূপ ইঙ্গিত দেয়, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা অথবা খুব সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপ্রদেশ, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

(খ) সর্বমঙ্গল, সাতনা, রেওয়া রাজ্য, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ৯ম শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

(গ) নাগিনী, খিচিং, উড়িষ্যা, খ্রীঃ ১০ম শতক—মধ্য-যুগীয় কক্ষ।

৬ নং চিত্র ঃ (ক) সোমাস্কন্দ, দক্ষিণ ভারত, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১০ম শতক—প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(খ) আলিঙ্গন-চন্দ্রশেখর মূর্তি, দক্ষিণ ভারত, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১২শ শতক—প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(গ) পত্নীসহ বিষ্ণু, রংপুর, বঙ্গদেশ, মধ্যযুগ খ্রীঃ ১১শ শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

৭ নং চিত্র ঃ (ক) সরস্বতী, হালেবিড়, মহীশূর, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১২শ শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

(খ) গণেশ, যবদ্বীপ, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ৯ম শতক—মধ্যযুগীয় কক্ষ।

(গ) গরুড়, কম্বোজ, মধ্যযুগ, খ্রীঃ ১০ম শতক – মধ্যযুগীয় কক্ষ।

৮নং চিত্র ঃ (ক) দ্বিতীয় আলমগীরের সীলমোহরাঙ্কিত ফরমান, খ্রীঃ ১৮শ শতক – মুসলিম যুগীয় কক্ষ।

(খ) মীনাকরা কলস, পারস্য, খ্রীঃ ১৩শ শতক—মুসলিম-যুগীয় কক্ষ।

(গ) ওমর খৈয়ামের রুবাই লিখিত টালি, খ্রীঃ ১৭শ শতক—মুসলিম যুগীয় কক্ষ।

৯নং চিত্র : (ক ও ঙ) মহেন্‌জোদারোয় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(খ ও গ) মহেন্‌জোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহর—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(ঘ) হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহর—প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ

(চ) কোশামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(ছ) নন্দনগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(জ) হরপ্পায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(ঝ) পিপরাহ্‌ওয়ায় প্রাপ্ত লেখযুক্ত ধাতুপাত্র—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(ঞ) নালে প্রাপ্ত চিত্রিত পোড়ামাটির পাত্র—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(ট) মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

(ঠ) ভীটায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—
প্রাগৈতিহাসিক কক্ষ।

১০ নং চিত্র : নাগরীলিপির ক্রমবিকাশের তালিকা—
দ্বিতল বারান্দা।

১১ নং চিত্র : বাংলালিপির ক্রমবিকাশের তালিকা—
দ্বিতল বারান্দা।

১২ নং চিত্র : প্রাগৈতিহাসিক, আদি-ঐতিহাসিক ও ঐতি-
হাসিক কেন্দ্র ও স্মৃতিস্তম্ভ চিহ্নিত মানচিত্র।

ভূমিকা

ভারতীয় সংগ্রহশালার পুরাতত্ত্ব বিভাগের বৃহৎ ও সমৃদ্ধ সংগ্রহ ভারতের বৃহত্তম সংগ্রহশালার উপযুক্তই শুধু নয়, সমগ্র প্রাচ্যের অমূল্য সংগ্রহগুলিরও অন্যতম। দর্শক সাধারণ যাহাতে বিভিন্ন কক্ষে প্রদর্শিত এই পুরাবস্তুগুলির সংগে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচিত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকাটি রচিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, বিস্তারিত বিবরণ বর্জন করিয়া কেবল মাত্র অপরিহার্য ও উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবেশ কক্ষ

প্রাচীন ভাস্কর্য : মৌর্য ও শুঙ্গ

সংগ্রহশালায় প্রবেশ করিয়াই দর্শনার্থী ভাস্কর্যকলার চারিটি অনুপম নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। ইহাদের সবকয়টিই স্তম্ভশীর্ষ—দুইটি মূল নিদর্শন এবং দুইটি প্লাস্টারের প্রতিকৃতি। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে কয়েকটি যক্ষ ও যক্ষিণী মূর্তি—ইহাদের মধ্যে একটি প্লাস্টারের প্রতিকৃতি। এইগুলি এই বিভাগের ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনতম মূর্তিকলার অন্যতম নিদর্শন। রামপূর্বায় প্রাপ্ত বৃষের* প্রতিমূর্তিটির গঠনভঙ্গিমা অপূর্ব। সম্ভবতঃ মহেন্‌জোদারোর সীলমোহরে খোদিত বৃষমূর্তিগুলির পরে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় বৃষের

---

* মূল নিদর্শনটি ভারতীয় সংগ্রহশালার, এবং ইহাকে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবনে ঋণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে; পরিবর্তে এখানে একটি প্লাস্টারের প্রতিকৃতি রাখা হইয়াছে।

এমন সার্থক রূপায়ণ আর নাই। ঐ একই স্থানে প্রাপ্ত সিংহশীর্ষটিও [১ নং চিত্র, 'ক'] অপরূপ। ইহার তলদেশে খোদিত হংসশ্রেণী অতীব সজীব ও প্রাণবন্ত। এই জাতীয় মূর্তিকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সারনাথে প্রাপ্ত সিংহশীর্ষ, যাহার একটি প্লাস্টারের প্রতিকৃতি এখানে রাখা হইয়াছে। ইহার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিতে ইরাণীয় প্রভাব বর্তমান। পাটনায় প্রাপ্ত যক্ষমূর্তিগুলিতে [১ নং চিত্র, 'খ'] মৌর্যকালীনবিশিষ্ট মসৃণতা এইগুলিকে তৎকালীন শিল্প কর্মরূপে প্রমাণ করে, কিন্তু ভারহুত ভাস্কর্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বেসনগরের যক্ষিণী [১ নং চিত্র, 'গ'] খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের বলিয়া অনুমিত হয়। কল্পদ্রুমশীর্ষটিকে শুঙ্গকালীন বলা হয়, তবে ইহা মৌর্যকালীনও হইতে পারে। বৃষভশীর্ষের তলদেশে মধুলতিকা, গোলাপ পুষ্প ও তালপত্রের অলঙ্করণ এবং তাহার নিম্নে রজ্জুর সজ্জা, রামপূর্বায় প্রাপ্ত সিংহটির বলিষ্ঠ গঠন, সারনাথে প্রাপ্ত সিংহশীর্ষটির তলদেশে কতকগুলি চক্রের অন্তরালে বৃষ, অশ্ব, সিংহ ও হস্তীর সুচারু রূপায়ণ তথা একত্র সমাবিষ্ট সিংহচতুষ্টয়ের এবং মূর্তিগুলির উপরের মসৃণতা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। পাটনায় প্রাপ্ত যক্ষ দুইটির পশ্চাদ্দেশে উত্তরীয়ের উপরিভাগে খোদিত লেখটি যদিও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের, তবুও স্থানে স্থানে মসৃণতার আভাস এবং মুখাবয়বের বৈশিষ্ট্য এইগুলিকে মৌর্যকালীন বলিয়া সূচিত করে। পাটনার যক্ষদ্বয়ের উপবীতের রীতিতে পরিহিত উত্তরীয়, স্থূল কটিসূত্রগুচ্ছ, বাজুবন্ধ ও কণ্ঠহার এবং বেসনগরের যক্ষিণীটির বেণীবন্ধ, সযত্নরচিত কটিবন্ধনী ও মেখলা, পারখাম যক্ষের উদরবন্ধ, কটিসূত্র এবং গুরুভার কণ্ঠভূষণ ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা বিশেষভাবে দর্শনীয়। কল্পদ্রুমটি একটি কুবের-মন্দিরের স্তম্ভ বা ধ্বজশীর্ষ। ইহার পত্রপুঞ্জের নিম্নে শঙ্খ, কমল-নিঃসৃত মুদ্রা, রত্নের থলি ও কলসগুলি 'নিধি' (বা ঐশ্বর্যের) দ্যোতক।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি (অশোককালীন) মৌর্যকলার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শন মেলে মৌর্য রাজত্ব কালে। এই ভাস্কর্যের কলাগত বৈশিষ্ট্য আংশিকভাবে ইরাণীয় শিল্পীর কাছে ঋণী। খ্রীঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত ইরাণীয় শিল্পীদের সান্নিধ্যই ইহার কারণ। বিভিন্ন পশুমূর্তি সম্বলিত ঘণ্টাকৃতি স্তম্ভশীর্ষগুলি এই মিশ্র শিল্পরীতির সুন্দরতম উদাহরণ। মূর্তিগুলির সম্পাদনায় বাস্তবতাবোধের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় সমন্বয় ঘটিয়াছে ঐতিহ্যনিষ্ঠ সিদ্ধরীতির। বৃহৎ ও বলিষ্ঠ কলাকৃতিব পরিচায়ক এই মূর্তিগুলির উপরিভাগের মসৃণতায় ইরাণীয় শিল্পরীতির প্রভাব সুচিহ্নিত।

অভিজাত ও আন্তর্জাতিক মৌর্য শিল্পকলা এবং মৌর্যোত্তর যুগের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শুঙ্গকলার মধ্যে প্রভেদ আছে কারণ শুঙ্গকলা সরলতামণ্ডিত ও লোকায়ত শিল্পরীতি প্রভাবিত। কিন্তু মৌর্যকলায় দেশীয় ভাবধারার সঙ্গে বিদেশীয় রীতিপ্রকরণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাই এই যুগের স্বাধীনভাবে স্থাপিত পশুমূর্তি শোভিত অশোককালীন স্তম্ভগুলি স্পষ্টতঃই প্রাচীন ভারতীয় বিষ্ণু, কুবের ও মন্মথ মন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত ধ্বজস্তম্ভের অনুসরণে পরিকল্পিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের বিভিন্ন অংশে বৈদেশিক প্রভাবও সমানভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়।

ভারহুত কক্ষ

প্রাচীন ভাস্কর্য ঃ শুঙ্গ, সাতবাহন ও কলিঙ্গ

মধ্যপ্রদেশের নাগোড় রাজ্যের ভারহুতে প্রাপ্ত বিশাল স্তূপতোরণ ও বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষগুলি শুঙ্গকলার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই তোরণ ও বেষ্টনীর উপর খোদিত মূর্তিগুলি পূর্ববর্তী মৌর্যকলায় দৃষ্ট ইরাণীয় প্রভাব রহিত, এবং মূর্তিগুলির অকৃত্রিম সারল্যে দেশজ শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট। এই কক্ষটিতে প্রদর্শিত স্তূপের পূর্ব দিকের তোরণ সহ বেষ্টনীর অংশটি জেনারেল কানিংহাম উদ্ধার করেন। ইহার গাত্রে খোদিত মূর্তিগুলিতে বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় কলারীতির ঐতিহ্য পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। যক্ষ, যক্ষিণী, দেবতা এবং অন্যান্য পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলিতে সুক্ষ্ম অলঙ্করণের প্রতি ভাস্করের উৎসাহ লক্ষণীয়, যথা দেহের উপর চিত্রিত অঙ্গপ্রসাধন অথবা পরিধেয় ও উষ্ণীষের কারুকার্য। যদিও শারীরস্থান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয়, তবুও সামগ্রিক ভাবে এই কলারীতির একটি নিজস্ব কারুকার্যময় মাধুর্য আছে, যাহার আবেদন বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সিরিমা-দেবতা [১নং চিত্র, 'ঘ'] এবং চুলকোকার মনোহর মূর্তি দুইটিতে। তোরণ দ্বারের একটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের একটি লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, তোরণটি শুঙ্গদের রাজত্ব কালে নির্মিত। ইহাভিন্ন বিভিন্ন মূর্তির ও দৃশ্যের নিম্নে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী পরিচয় লিপিগুলি হইতে তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। বেষ্টনীর উপরিভাগে উষ্ণীষপট্টে সর্পিল ভঙ্গিতে খোদিত আছে এক দিব্যহস্তীর মুখনিঃসৃত একটি কল্পবল্লী-লতা, যাহার গতিভঙ্গের অবকাশগুলিতে

জাতক কাহিনীর দৃশ্যগুলি রচিত হইয়াছে। সূচী ও বেদিকাগুলি পদ্মের কারুসজ্জা এবং জাতক-আখ্যান ও বুদ্ধজীবনের দৃশ্য-খোদিত মণ্ডলকগুলি দ্বারা শোভিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি স্তম্ভে আছে যক্ষ ও দেবতাদের পূর্ণাবয়বমূর্তি। জাতক দৃশ্যের পরিচয়লিপিগুলি কখনও কখনও অন্যরূপ হইলেও সাধারণতঃ জাতক গ্রন্থে প্রদত্ত পরিচয়লিপির অনুরূপ। বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলীর সজীব রূপায়ণ, যেমন অনাথপিণ্ডকের জেতবন-বিহার সম্প্রদান, অথবা প্রসেনজিতের বুদ্ধ সন্দর্শন দৃশ্যটি কেবল মাত্র দুর্লভ কৌতুকরসপূর্ণ আরামদূসক-জাতকের একটি দৃশ্যের সমতুল্য,—যেখানে একদল বানর বৃক্ষের মূল উৎপাটন করিয়া প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ নির্ণয় করিতেছে। পরবর্তী পর্যায়ের শুঙ্গকলার পরিচয় পাওয়া যাইবে বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত স্তূপবেদিকার মূর্তিগুলিতে, যাহার কয়েকটি নিদর্শন ও কয়েকটি প্রতিকৃতি এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারহুত এবং বুদ্ধগয়ার বেষ্টনী দুইটিতে রূপায়িত জেতবন *দৃশ্য* দুইটির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ের শুঙ্গকলার সজীবতা সহজেই প্রতিভাত হয়।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের জীবনের ও পূর্বজন্মের কয়েকটি বিশেষ কাহিনীর উল্লেখ প্রয়োজন; কারণ খোদিত দৃশ্যগুলির অধিকাংশই তাঁহার জীবন ও পূর্বজন্ম সংক্রান্ত। লটুকিক-জাতক, ব্রাহ্মীতে লুটভ-জাতক নামে যাহার পরিচয়লিপি দেওয়া হইয়াছে, উহা একটি বটের পক্ষীর এক দুর্বৃত্ত হস্তীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের কাহিনী। বোধিসত্ত্ব একবার হস্তীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একটি বটের পক্ষীর শাবকদের প্রতি করুণা-পরবশ ছিলেন। কিন্তু এক দুর্বৃত্ত হস্তী তাহাদের বিনাশ করায় বটের পক্ষীটি একটি বায়সকে তাহার চক্ষু দুইটি উৎপাটিত করিতে প্ররোচিত করে। অবশেষে এক ভেকের ডাক অনুসরণের ফলে বিপথগামী হইয়া দুর্বৃত্ত হস্তীটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এবং সেখান হইতে পদস্খলন

হওয়ার ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে। পশুর ভিতরেও মানুষের সমস্ত অনুভূতিক্ষমতা আছে তাহারই একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল এই কাহিনীটি।

ছদ্দন্ত-জাতক, নিগ্রোধমিগ-জাতক এবং মহাকপি-জাতকের পশুচরিত্রে আমরা এমন মহানুভবতা দেখিতে পাই যাহা মনুষ্যচরিত্রেও দুর্লভ এবং এই মহানুভব পশুটি বোধিসত্ত্বেরই বিভিন্ন পর্যায়ের পূর্বজন্মরূপ, যাহার মাধ্যমে তাঁহার মহাবোধিলাভের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ছদ্দন্ত-জাতকে এমন একটি হস্তীর গল্প বর্ণিত আছে যে, বারাণসীর রাণীর খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় আপন দন্ত উৎসর্গ করে, যদিও সে অনায়াসেই যে ব্যাধটি তাহার দন্ত সংগ্রহ করিতে আসে তাহাকে সংহার করিতে পারিত। সম্পূর্ণ কাহিনীটি এইরূপ : একবার বোধিসত্ত্ব এক ছয় দন্তযুক্ত হস্তীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। একদিন তিনি তাঁহাদের একজনকে পদ্মফুল উপহার দেন, সেই জন্য অপরজন ঈর্ষান্বিতা হইয়া উঠেন। এই শেষোক্তজন মৃত্যুর পর পুনরায় বারাণসীর রাণী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পীড়ার ছল করিয়া তিনি জিদ ধরিলেন যে ঐ মহানুভব হস্তীটির দন্ত না হইলে তাঁহার আরোগ্য লাভ সম্ভব নয়। রাজা সেই হস্তীটির দন্ত আনয়নের জন্য শিকারীদল পাঠান। কিন্তু হস্তীটি স্বেচ্ছায় আপন দন্ত তাহাদের সম্প্রদান করেন, এবং দন্ত-উৎপাটনের সময় তীব্র যন্ত্রণার ফলে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। তিনি জানিতেন যে, নশ্বর দেহ অপেক্ষা অন্তরে উপলব্ধ জ্ঞানই শ্রেয়। অবশ্য রাণী দন্তগুলি দেখিয়া এমন অভিভূত হইয়া পড়েন যে, দুঃখে ভগ্নহৃদয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিগ্রোধমিগ-জাতকের গল্পটিও সমভাবে শিক্ষাপ্রদ। একবার বোধিসত্ত্ব স্বর্ণমৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজোদ্যানের মৃগকুলের

দলপতি ছিলেন। রাজার শিকারপ্রীতির ফল স্বরূপ নির্বিচারে মৃগহনন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিদিন পালাক্রমে একটি করিয়া মৃগ বধের জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। একদিন একটি গর্ভবতী মৃগীর পালা আসে; কিন্তু বোধিসত্ত্বের হৃদয় করুণায় এত বিগলিত হয় যে, তাহার পরিবর্তে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গের সঙ্কল্প করেন। রাজা বধ্যভূমিতে আসিয়া ইহা দেখিয়া এত বিচলিত হইয়া পড়েন যে, তিনি স্বর্ণমৃগটির প্রাণরক্ষা তো করেনই, উপরন্তু সেই দিন হইতে মৃগহত্যা বন্ধ করিয়া দেন।

মহাকপি-জাতকে বর্ণিত আছে, কিভাবে বোধিসত্ত্ব একবার বানরকুলের দলপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বসবাস করিতেন এবং সুস্বাদু আম্রফল খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বারাণসীরাজ একদিন সেই স্থানে আসিয়া বোধিসত্ত্ব যে বৃক্ষে থাকিতেন সেটি ঘেরাও করিয়া বানরদের হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন। বোধিসত্ত্ব এক লম্ফে নদী পার হইয়া তৎক্ষণাৎ বাঁশের একটি সেতু তৈয়ারী করিয়া ফেলেন, এবং সেতুটি দৈর্ঘ্যে ছোট হওয়ায় নিজ দেহদ্বারা সেই ব্যবধানটুকু পূরণ করিয়া অন্যান্য বানরগণকে তাহার উপর দিয়া পলায়নের সুযোগ করিয়া দেন, যদিও ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। রাজা বোধিসত্ত্বের বুদ্ধি এবং আত্মোৎসর্গের আগ্রহ দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেন।

বোধিসত্ত্ব কয়েকবার মানব জন্মও গ্রহণ করেন, এবং প্রতিবারই বুদ্ধি, মহানুভবতা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করেন। একবার তিনি বিধুরপণ্ডিত নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক রাজার মন্ত্রীপদ লাভ করেন এবং বুদ্ধিতে ও বাগ্মীতায় নিজের বিশেষ যোগ্যতা প্রমাণিত করেন। নাগরাণী বিমলা তাঁহার নিকট ধর্মব্যাখ্যা শুনিতে চান এবং অসুস্থতার

ছল করিয়া বিধুরের হৃৎপিণ্ড ছাড়া তাঁহার আরোগ্যলাভ হইবেনা, এই দাবী করেন। তখন তাঁহার কন্যা আপন প্রেমিক যক্ষ পুন্নককে বিধুরের হৃৎপিণ্ড আনিবার জন্য প্ররোচিত করে। পুন্নক রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া বিধুরকে জয় করে কিন্তু এই যুদ্ধ যে অবৈধ তাহা মহামতি বিধুরকে বুঝাইতে রাজা ব্যর্থ হন। পুন্নক বিধুরকে লইয়া গিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড লইবার জন্য তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিধুর পুন্নককে এই প্রয়াসের নিরর্থকতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন, এবং নাগরাণীর কাছে তাহাকে লইয়া যাইতে বাধ্য করেন। অবশেষে নাগরাণীর সম্মুখে তিনি তাঁহার হৃদয়ের জ্ঞানসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

একবার বুদ্ধ বেস্‌সন্তর নামে এক রাজকুমাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার বুদ্ধ জন্মের অব্যবহিত পূর্বজন্ম। যুবরাজ বেস্‌সন্তরের দান-প্রীতি এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার রাজ্যের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ একটি সৌভাগ্যদায়ক হস্তীকে অনাবৃষ্টিগ্রস্ত কলিঙ্গরাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য কলিঙ্গবাসীদের উপহার দেন। ক্রুদ্ধ প্রজাগণ ইহার ফলে রাজার নিকট যুবরাজের সপরিবার বনবাস দাবী করে। বনে গমন করিয়াও তিনি স্বেচ্ছায় আপন স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দান করিয়া দেন। যুবরাজের কঠিন পরীক্ষার ইহা একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী, যদিও ইহার পরিণতি মধুর।

এই সমস্ত কাহিনীগুলিতে বোধিসত্ত্ব, যিনি উত্তরকালে গৌতমবুদ্ধ-রূপে মহাবোধি লাভ করিবেন, তাঁহার মহৎগুণাবলীভূষিত এবং আধ্যাত্মিকতায় সমুন্নত স্বভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধের নিজ জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী হইতেও এখানে কয়েকটি দৃশ্য মনোনীত হইয়াছে। মায়া দেবীর স্বপ্নটি রচিত হইয়াছে একটি মণ্ডলকের মধ্যে, যাহাতে বোধিসত্ত্ব এক শ্বেত হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া তুষিৎ-স্বর্গ

হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছেন। ইহার পরিচয়-লিপিতে উৎকীর্ণ আছে "ভগবতো উক্রন্তি", অর্থাৎ "ভগবানের (বুদ্ধের) অবতরণ"। এইরূপে কোশলের রাজা প্রসেনজিতের বুদ্ধ সম্বর্ধনা, নাগরাজ এরপতের বুদ্ধ পূজা, অজাতশত্রুর বুদ্ধ দর্শন, গন্ধর্ব পঞ্চশিখ সহ শক্রের ইন্দ্রশালগুহায় বুদ্ধ সমীপে আগমন ইত্যাদি দৃশ্যগুলি এক একটি মণ্ডলকে খোদিত হইয়াছে। এই সমস্ত দৃশ্যাবলীর নীচে তাহাদের পরিচয়ালপিও উৎকীর্ণ আছে। মাতার নিকট ধর্মব্যাখ্যার পর ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বুদ্ধের অবতরণের দৃশ্যটি যে মণ্ডলকে উৎকীর্ণ, সেখানে অবতরণিকার উপরে এবং নীচে বুদ্ধের পদচিহ্নগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যকলায় বুদ্ধের মানুষী-মূর্তির পরিবর্তে যে প্রতীকের প্রবর্তন হইয়াছিল শুধু তাহাই নয়, একটি সংক্ষিপ্ত প্রতীকের ব্যঞ্জনায় বুদ্ধের সম্পূর্ণ অবতরণ-ক্রিয়াটিও কুশলী শিল্পী যেরূপে দৃশ্যমান করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাও লক্ষণীয়। জেতবন-সম্প্রদানের দৃশ্যটি বুদ্ধের জীবনের একটি চমকপ্রদ ঘটনা। সম্প্রদানের পূর্বে কিরূপে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক সমগ্র জেতবনভূমি স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সেই বিপুল পরিমাণ মুদ্রায় জেতবনটি ক্রয় করেন, পরিচয়লিপিতে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আছে অন্যান্য বিগতকল্পের বুদ্ধ, যথা বিপশ্যিন, বিশ্বভূ, ক্রকুছন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপ প্রভৃতির নিজ নিজ বোধিদ্রুম সহ মূর্তি। কিন্তু বিশেষভাবে যক্ষ ও যক্ষিণীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলিই ভারহুতের স্তূপ-বেষ্টনীর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক মূর্তি। সিরিমা দেবতা, চুলকোকা, যক্ষ-সুপবাস, যক্ষিণী-সুদর্শনা ও যক্ষ-কুবের নামে পরিচিত অপরূপ মূর্তিগুলির বসনভূষণে তৎকালীন সাজসজ্জারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি শুঙ্গশিল্পকর্মের অপূর্ব নিদর্শন। সুবৃহৎ ও সমারোহপূর্ণ তোরণটি [২নং চিত্র, 'খ'] পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ভারহুতে যেরূপ ছিল, তার যথার্থ

রূপটির ধারণার জন্য অংশত প্রাপ্ত মূল নিদর্শনের সঙ্গে কিছু কিছু প্লাস্টারের প্রতিকৃতি যোজনা করিয়া সম্পূর্ণ তোরণটি ও তৎসহ বেদিকার কিছু অংশ এখানে পুনর্গঠিত হইয়াছে।

ভারহুতের স্তূপবেদিকার পরে আছে বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত বেদিকার ভগ্নাবশেষ। কয়েকটিমাত্র মূল নিদর্শন এবং অধিকাংশই প্লাস্টারের প্রতিকৃতি দ্বারা ইহা পুনর্গঠিত হইয়াছে। এই বেদিকার গাত্রে খোদিত মূর্তিগুলি ভারহুতের মূর্তিগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতেও জেতবন-সম্প্রদানের কাহিনীটি পুনরুক্ত হইয়াছে, এবং ইহার রূপায়ণে আঙ্গিক-কৌশলের দিক হইতে শিল্পীর সুনিশ্চিত অগ্রগতি ঘটিলেও ভারহুত-শিল্পের প্রাণবন্ততার একান্তই অভাব। ক্রমপরিণতির দিক হইতে বুদ্ধগয়ার শিল্পশৈলী ভারহুত ও সাঁচী শিল্পশৈলীর মধ্যপথবর্তী।

সাঁচীতে প্রাপ্ত একটি মাত্র মূল নিদর্শন—তোরণ-শালভঞ্জিকা এবং ভারহুত স্তূপে খোদিত বুদ্ধের জীবন ও জাতক দৃশ্যের অনুরূপ কয়েকটি দৃশ্যের প্রতিকৃতি মধ্যভারতে প্রারম্ভিক অধ্যায়ের সাতবাহন শিল্পশৈলীর সঙ্গে ভারহুত শিল্পশৈলীর তুলনামূলক আলোচনার জন্য এখানে রাখা হইয়াছে। সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারে খোদিত মহাকপিজাতক ও বারাণসীর রাজার দ্বারা ভ্রমক্রমে নিহত অন্ধ পিতামাতার একমাত্র পুত্র স্যামের মর্মস্পর্শী কাহিনী এবং ইহা ছাড়া বুদ্ধের জীবনের অন্যান্য ঘটনা—যথা উরুবিল্বের ধর্মান্তরিতকরণের জন্য প্রভু বুদ্ধ কর্তৃক নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়ার সম্পাদন, বুদ্ধকে শ্রাবস্তীর এক বানরের মধুদান ইত্যাদি দৃশ্যগুলির প্রতিকৃতিও এখানে রক্ষিত আছে। সাঁচীর শিল্পকর্মে লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিকতর মূর্তিরচনারীতি উদ্ভাবনে শিল্পীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সম্মুখভঙ্গিতে মূর্তিগঠনরীতির কিছুটা বর্তমান থাকিলেও

পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে শিল্পী এস্থলে অধিকতর সজাগ। খোদিত বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ, উচ্চতা, দূরত্ব এবং গভীরতার যথাযথ রূপায়ণে শিল্পীকে সচেষ্ট হইতে দেখা যায়। তবে কেবলমাত্র অমরাবতীর সাতবাহন মূর্তিকলার শেষ পর্যায়েই শিল্পী আঙ্গিকের পরিপূর্ণতা সাধনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হন।

সমসাময়িক কলিঙ্গ শিল্পকলার পরিচয় দেওয়ার জন্য উড়িষ্যার খণ্ডগিরির গুহাগাত্রে ভাস্কর্যভূষার যে বেষ্টনী আছে, তাহার কয়েকটি প্রতিকৃতি সারিবদ্ধভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইগুলির বিষয়বস্তু জৈন পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মূর্তি এবং কারুকার্য খোদিত এই গুহাগুলি জৈন সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য ভারতের অন্যান্য স্থানের মতন পাহাড় কাটিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। এইগুলি সম্রাট খারবেলের সময়ের ; বিখ্যাত হস্তীগুম্ফা শিলালেখে যিনি কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছেন। (অধুনা কলিঙ্গ শিল্পকলার প্রতিকৃতিগুলি সংগ্রহশালার অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে)।

এই কক্ষের অন্যান্য বিবিধ দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে পাটনায় প্রাপ্ত দুইটি বেদিকা এবং দুইটি সূচী দ্বারা গঠিত একটি ছোট বেষ্টনী, যাহার সূচীর উপর একটি মণ্ডলকে খোদিত আছে শিশুসহ যক্ষিণী-অশ্বমুখীর মূর্তি, মিথুন মূর্তি সম্বলিত আরও কয়েকটি বেদিকা, পাটনার কুমরাহারে প্রাপ্ত শ্যেনসিংহ এবং রাজগীরে প্রাপ্ত নাগফণা। কুমরাহার এবং রাজগীরে সংগৃহীত প্রস্তরমূর্তিগুলির উপরিভাগের মসৃণতা লক্ষণীয়।

সাতফুট দীর্ঘ এবং পাঁচটি ছিদ্রযুক্ত যে কাষ্ঠদণ্ড দুইটি এখানে রক্ষিত হইয়াছে, সে দুইটি খুব সম্ভবতঃ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে পাটলিপুত্র নগরীকে ঘিরিয়া যে কাষ্ঠময় বেষ্টনী ছিল, তাহারই ভগ্নাবশেষ।

গান্ধার কক্ষ

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বহু সংস্কৃতির সংগমস্থল এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পর হইতে গ্রীকদের প্রভাব এই অঞ্চলের মূর্তিশিল্পে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। গ্রীকদের স্থানচ্যুত করিয়া আসে শকেরা, এবং তাহারাও কুষাণদের দ্বারা পরাভূত হয়। ইহারা সকলেই কম বেশী পাশ্চাত্য শিল্পকলার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। মূর্তিগুলির দৈহিক গঠনে, পরিধেয়ের ভাঁজের বৈশিষ্ট্যে, কেশ-বিন্যাসে এবং অঙ্গভঙ্গিমায় পাশ্চাত্য প্রভাবের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বুদ্ধের প্রাচীনতম মানুষী মূর্তিটি, যাহা এই গান্ধার অঞ্চলেই পাওয়া যায়, যেন এক গ্রীক তরুণের মূর্তি। উষ্ণীষ, মকরকণ্ঠী প্রভৃতি রত্নহার এবং উত্তরীয় পরিহিত বোধিসত্ত্বগুলি [৩নং চিত্র, 'ক'] যেন গ্রীক ছদ্মবেশে ভারতীয় সত্তা। মায়াদেবী ও হারিতীর মূর্তি দুইটি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, নারীমূর্তিগুলিও একই প্রকারে রূপায়িত হইয়াছে। অন্যান্য মূর্তিগুলি, যথা মদোল্লাসীর দল, স্তম্ভশিরোবাহী মূর্তি, পুষ্পমাল্যবাহীর দল এবং করিন্থীয় স্তম্ভশীর্ষগুলি গ্রীক ভাস্কর দ্বারা রচিতই হউক অথবা গ্রীকদিগের দ্বারা শিক্ষিত ভারতীয় ভাস্কর কর্তৃক রচিতই হউক, গভীর গ্রীক প্রভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করিতেছে। যদিও সাধারণ ভাবে গান্ধার মূর্তিশিল্পে ধ্রুপদী গ্রীক চারুকলার মাধুর্য অবর্তমান, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, এই শৈলীর কয়েকটি নিদর্শন অতীব রমণীয়। উদাহরণ স্বরূপ, হারিতি ও পাঞ্চিকের মূর্তিটি উল্লেখনীয়। গান্ধার মূর্তিশিল্পে এবং দেশজ মূর্তিশিল্পে রূপায়িত বুদ্ধজীবনীর তুলনামূলক আলোচনা কৌতূহলো-দ্দীপক, যথা মায়াদেবীর পার্শ্বদেশ হইতে বুদ্ধের জন্ম-দৃশ্যটি রূপায়ণে

গান্ধারশিল্পের স্বকীয়তা পরিস্ফুট যাহা দেশজশিল্পে অবর্তমান। কয়েকটি মূর্তিতে তারিখসহ খরোষ্ঠী-লেখ উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারিখগুলি কোন্ বিশেষ অব্দের তাহা আজও অনিরূপিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে এই শিল্পশৈলীর অপকর্ষ ঘটে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে আর একটি নূতন শৈলীর আবির্ভাব হয়, জন মার্শাল যাহার নামকরণ করেন ইন্দো-আফ্গানশৈলী। মাটি, চুনবালি এবং পোড়ামাটির চমৎকার নিদর্শনগুলির মাধ্যমে এই শৈলী আত্মপ্রকাশ করে। আফগানিস্থানের জালালাবাদের নিকটবর্তী হদ্দা নামক স্থানটি এই ইন্দো-আফ্গানশৈলীর উৎপত্তিস্থল হইলেও ভারতের তক্ষশিলাতেও ইহার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। লোরীয়ান টাঙ্গাইএ প্রাপ্ত লেখযুক্ত বুদ্ধমূর্তিটি সহ বিভিন্ন আয়তন ও উৎকর্ষের অন্যান্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদিগুলিতে সাজান আছে। মধ্যস্থলে প্রদর্শনাধারে সজ্জিত আছে পাথরে খোদিত বুদ্ধ-জীবনী ও জাতক-আখ্যান। এখানে বুদ্ধ-জীবনীর রূপায়ণ বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক, কারণ বুদ্ধের জীবনের এমন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে রূপায়িত হইয়াছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায় না। [সম্প্রতি বুদ্ধ-জীবনের দৃশ্যগুলি ঘটনাবলীর ক্রমানুসারে এই কক্ষে সাজান হইয়াছে।] তাহা ছাড়া অন্যান্য খোদিত দৃশ্যগুলি অন্যত্র প্রাপ্ত দৃশ্যগুলির সহিত তুলনামূলক আলোচনার জন্য উল্লেখযোগ্য। গান্ধার কক্ষে প্রদর্শিত হারীতি ও পাঞ্চিক, হারকিউলিস, পুষ্পমাল্যবাহীদল এবং অন্যান্য বিবিধ মূর্তি, চুনবালির তৈয়ারী মস্তকগুলি এবং প্রাগৈতিহাসিক কক্ষে প্রদর্শিত তক্ষশীলায় প্রাপ্ত শিল্পবস্তুগুলি গান্ধার মূর্তিশিল্প অনুশীলনের অতি মূল্যবান উপাদান। গান্ধার-কক্ষের কেন্দ্রস্থলে যে ছোট অর্ঘ্যস্তূপটি রাখা হইয়াছে, সেটিও কম সুন্দর নয়। গান্ধার অঞ্চলে প্রচলিত স্তূপগঠনরীতির ইহা একটি সুন্দর নমুনা।

গুপ্ত ও মধ্যযুগীয় কক্ষ

[প্রারম্ভিক ভাস্কর্য—মথুরার কুষাণশৈলী এবং অমরাবতীর সাতবাহনশৈলী। ভূমারা ও সারনাথের গুপ্ত ভাস্কর্য। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, দক্ষিণভারতের মূর্তিকলা, যবদ্বীপ এবং কম্বোজের ভাস্কর্য।]

গান্ধার কক্ষের পূর্বদিকে দীর্ঘকক্ষের কুড়িটি কক্ষাংশে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, এবং যবদ্বীপ ও কম্বোজ হইতে সংগৃহীত মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম কক্ষাংশটি ব্যবহৃত হইয়াছে প্রধানতঃ মথুরার কুষাণমূর্তিকলা প্রদর্শনের জন্য।

কুষাণ ভাস্কর্য

ভারহুত, পাটনা ও বোধগয়ার প্রাচীন দেশজ শিল্পকলার পরিণতির ধারাটিকে অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের কুষাণশৈলীর মূর্তিকলা আত্মপ্রকাশ করে। ইহার কেন্দ্রস্থল মথুরায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে। এই সময় মথুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র ছিল, যেখান হইতে অগণিত মূর্তি অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইত। ইহার বিখ্যাত উদাহরণ বল নামক জনৈক সন্ন্যাসী দ্বারা শ্রাবস্তী, মথুরা, সারনাথ এবং অন্যান্যস্থানে উৎসর্গীকৃত একাধিক বোধিসত্ত্ব-মূর্তি। কুষাণশৈলীর বুদ্ধমূর্তিগুলির গঠন কিছুটা স্থূল ও গুরুভার, গুপ্তকালীন বুদ্ধমূর্তির মত সৌষ্ঠবসম্পন্ন নয়; কিন্তু যক্ষিণী মূর্তিগুলি এবং খাদ্য ও পানীয় হস্তে জনৈকা তরুণীর মূর্তিটি অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। পাশ্চাত্য গান্ধারশৈলীর প্রভাব কখনও কখনও

কুষাণমূর্তিতে দেখা যায়, যেমন মথুরা সংগ্রহশালায় রক্ষিত গ্রীকরীতিতে রচিত হারিতীমূর্তিটি। কিন্তু সাধারণতঃ মথুরার কুষাণমূর্তিগুলি গান্ধার প্রভাব মুক্ত। মথুরা সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েকটি মূর্তি যথা, মদোল্লাসীদের মূর্তি, সিংহসহ হারকিউলিস এবং হারিতীর মূর্তিটিতে গান্ধার প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু দীর্ঘ অঙ্গরাখা ও পাদুকা পরিহিত কনিষ্ক এবং অন্যান্যদের প্রতিকৃতি-মূর্তিগুলিতে বিদেশী, সম্ভবতঃ তুর্কোম্যান, প্রভাব বর্তমান। এই যুগের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শনগুলি দেশজ রীতিতে রূপায়িত এবং সাধারণতঃ বিদেশী প্রভাবমুক্ত। উষ্ণীষ পরিহিত বোধিসত্ত্ব, স্বচ্ছবাস পরিহিতা যক্ষিণী, মুণ্ডিতমস্তক অথবা দক্ষিণাবর্তকেশ এবং অর্ধবৃত্তরেখাঙ্কিত প্রভামণ্ডল-শোভিত বুদ্ধমূর্তি, কিংবা বুকে শ্রীবৎস-চিহ্নসহ একমুখ বা চৌমুখ জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলির সরলতা প্রাচীন দেশজ মূর্তিগুলিরই অনুরূপ। কিন্তু সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য অর্জনে শিল্পীর অগ্রসরমানতাও লক্ষণীয়, যাহার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল পরবর্তী গুপ্তযুগে।

এখানে প্রদর্শিত, মথুরায় প্রাপ্ত কুষাণমূর্তিগুলির মধ্যে মদোল্লাসীদের দৃশ্য এবং সিংহসহ হারকিউলিসের মূর্তিটিতে গান্ধারশৈলীর প্রভাব বর্তমান। শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব মূর্তিটি কুষাণরীতির মূর্তির একটি অপূর্ব নিদর্শন এবং পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখ অনুযায়ী বল নামক জনৈক ভিক্ষু কর্তৃক উৎসর্গীকৃত। এই মূর্তিটি উক্ত সন্ন্যাসী-উৎসর্গীকৃত অন্যান্য বুদ্ধমূর্তিগুলির সমশ্রেণীর। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত লেখ-উৎকীর্ণ বেদিকায় উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের মূর্তিটিও সমান সুন্দর, কিন্তু এইটি পরবর্তীকালের। ইহার মধ্যে ভূতেশ্বরের যক্ষিণী তিনটি অতীব রমণীয় সৃষ্টি এবং নারীমূর্তি রচনায় কুষাণ ভাস্করের অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচায়ক (৩নং চিত্র, 'ঘ')। ইন্দ্রসাল গুহায় ইন্দ্রের বুদ্ধদর্শনের দৃশ্যটি একটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য। কনিষ্কের নাম-উৎকীর্ণ প্রতিকৃতির প্রতিলিপিটি

প্রতিকৃতি-মূর্তি হিসাবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সিংহের দেহ, মানুষের মুখ ও পাখীর ডানাযুক্ত ইহামৃগ নামক কল্পিত প্রাণীর ইন্দো-ইরাণীয় রীতির স্তম্ভশীর্ষটি কুষাণ শিল্পকর্মের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

বিপরীত কক্ষাংশে প্রদর্শিত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিটি অনেকাংশে শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত ভিক্ষু বল উৎসর্গীকৃত বুদ্ধমূর্তিটির অনুরূপ, কিন্তু পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখ অনুসারে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। এই কক্ষাংশে আরও কয়েকটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আছে, যেগুলি কুষাণ ও গুপ্তযুগের মধ্যবর্তীকালের। মধ্যস্থলে মহিমময় বুদ্ধমূর্তি দুইটি গুপ্তকলার বিশিষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং মথুরায় প্রাপ্ত গুপ্তমূর্তিকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সাতবাহন ভাস্কর্য

কুষাণ-মূর্তিকলা প্রদর্শিত কক্ষাংশের সংলগ্ন কক্ষাংশটিতে অমরাবতীর সাতবাহন-মূর্তিকলার অল্প কয়েকটি মূল্যবান নিদর্শন রক্ষিত আছে। খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণভারত ব্যাপিয়া সাতবাহন নামে এক প্রতাপশালী রাজবংশ রাজত্ব করেন। সাতবাহনদের পশ্চিম প্রান্তীয় রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানে, তাই পশ্চিম-ভারতে তাঁহাদের স্থাপত্যকলার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। এঁদেরই পূর্বপ্রান্তীয় রাজধানী ছিল অমরাবতীতে, যেখানে উত্তরকালীন সাতবাহন রাজারা মূর্তি ও কারুকার্যসমৃদ্ধ মহাসমারোহপূর্ণ এক স্তূপ নির্মাণ করেন। অমরাবতীর ভাস্কর্য সাতবাহন শিল্পনৈপুণ্যের চরম উদাহরণ। স্তূপবেদিকার সর্বত্র জাতক, অবদান এবং বুদ্ধজীবনীর আখ্যানমণ্ডিত। এইস্থানের ভাস্কর্যকলাকে চারিটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়টিতে ভারহুত-মূর্তিকলার সমকালীন অতি প্রাচীন শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের এবং ইহার শিল্পকর্মগুলি মুখ্যতঃ স্তূপগাত্রের ফলকগুলির উপর উৎকীর্ণ

বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা—তাঁর বোধিলাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, মহাপরিনির্বাণ। এখানে সিংহকে শাক্যসিংহের প্রতীকরূপে দেখান হইয়াছে এবং ত্রিরত্ন উপর্যুপরি স্থাপনা করিয়া রচনা করা হইয়াছে। পূর্ণঘট এবং নাগমূর্তিগুলিও এই অধ্যায়েরই শিল্পকর্ম। তৃতীয় অধ্যায়ে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হয় মহাসমারোহপূর্ণ স্তূপবেষ্টনীটি, যাহাতে ভাস্করের শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু বিবিধ, কারুকার্যের উপাদানও বিচিত্র, এবং সম্যক্ রূপ বর্ণনায় সফলকাম হইবার জন্য শিল্পী এখানে বিভিন্ন আঙ্গিকরীতি গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থ এবং সর্বশেষ অধ্যায়ের শিল্পকর্মের নিদর্শন--চৈত্যফলকের উপর নমনীয় রেখায় উৎকীর্ণ প্রলম্বিত গঠনের মূর্তিগুলি এবং কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি।

এই মূর্তিকলার প্রথম অধ্যায়টি ব্যতীত অপর তিনটি অধ্যায়ের নিদর্শন এই কক্ষাংশে রক্ষিত আছে। দীর্ঘ উষ্ণীষখণ্ডটিতে স্বর্গীয় গায়ক, বাদক ও নর্তক সমভিব্যাহারে বোধিসত্ত্বের মর্ত্যে অবতরণ, এবং মায়াদেবীর গর্ভে শ্বেতহস্তী প্রবেশ করিবার স্বপ্নদর্শনের দৃশ্য দুইটি অপূর্ব (২নং চিত্র, 'ক')। যে স্তূপফলকের তিনটি অংশকে পুনর্যোজিত করিয়া এখানে প্রদর্শিত করা হইয়াছে, তাহার উপর উৎকীর্ণ বুদ্ধজীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এবং পূর্ণঘটটি হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিল্পকর্মের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বুদ্ধজীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা—বোধিলাভ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন ও মহাপরিনির্বাণের দৃশ্যগুলি যথাক্রমে বোধিবৃক্ষ, চক্র এবং স্তূপের প্রতীক দ্বারা পর পর দেখান হইয়াছে। আর একটি উষ্ণীষখণ্ডে দেখা যাইবে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত যক্ষের দল সর্পিল ভঙ্গিতে রচিত পুষ্পমাল্য বহন করিয়া চলিয়াছে। সমস্ত বেষ্টনীটি জুড়িয়া উষ্ণীষখণ্ডের বহির্গাত্রে ইহা উৎকীর্ণ ছিল। দুইটি সূচীখণ্ডের উপর মণ্ডলকে উৎকীর্ণ অলংকরণটি দেখিলে বোঝা যায়

যে, কমলদলের মতন সরল এবং বৈচিত্র্যহীন বিষয়বস্তুটিকেও কত কুশলতার সঙ্গে রচনা করা হইয়াছে। দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি এই শৈলীর সর্বশেষ অধ্যায়ের নিদর্শন।

গুপ্ত ভাস্কর্য

বিপরীত কক্ষাংশে ভূমারায় প্রাপ্ত গুপ্তকলা এবং আরও তিনটি কক্ষাংশে সারনাথ এবং অন্যত্র-প্রাপ্ত গুপ্তকলার নিদর্শন রক্ষিত আছে।

ভারতীয় মূর্তিকলার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল গুপ্তযুগে। শিল্পে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে গুপ্তরাজত্বকাল এক গৌরবময় যুগ। কুষাণযুগের মূর্তিকলায় যে মনোহারিত্ব দেখা যায়, গুপ্তযুগের মূর্তিকলায় তাহা পূর্ণতর রূপ পায় এবং এইযুগের মূর্তিগুলি সংবেদনশীল ভাবলাবণ্যে এবং পেলব ও মাধুর্যময় দেহসৌষ্ঠবে অতুলনীয়। সারনাথে প্রাপ্ত ধর্মব্যাখ্যাতা বুদ্ধ ও পদ্মপাণি মূর্তি দুইটি এবং নাগোড় রাজ্যের কোহ্ নামক স্থানে প্রাপ্ত একমুখ-লিঙ্গটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কয়েকটি গুপ্তমন্দির, যথা দেওগড় ও ভূমারার মন্দিরগাত্রে প্রস্তরের উপর অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য দেখা যায়। অন্য কয়েকটি মন্দিরের প্রাচীর সজ্জায় দেখা যায়, পোড়ামাটির বড় বড় ফলকে উৎকীর্ণ কারুকার্য। এই যুগের অতি সুন্দর কারুকার্য-সমন্বিত পোড়ামাটির ফলক ভীটা, ভীটারগাঁও, রামনগর, রাজগীর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তযুগের প্রস্তরময় মূর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে মথুরা ও ভারতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রভামণ্ডল শোভিত মহিমময় বুদ্ধমূর্তিগুলি, সারনাথের অনাড়ম্বর ও সৌম্যদর্শন বুদ্ধমূর্তিগুলি, দেওগড়ের শেষনাগের উপরে শায়িত বিষ্ণু, গজেন্দ্রমোক্ষ এবং নর-নারায়ণ প্রভৃতি মূর্তি-খোদিত প্রস্তর ফলকগুলি, গোয়ালিয়র রাজ্যের উদয়গিরি গুহার বিপুলকায় বরাহমূর্তিটি ও অন্যান্য উৎকীর্ণ

দৃশ্যাবলী এবং অজন্তার সুবিখ্যাত মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত মন্দিরের দ্বাররক্ষয়িত্রী গঙ্গা ও যমুনা মূর্তির বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় আসামের দহপর-ভাটীয়ার মন্দিরদ্বারটিতে এবং বরাহ-অবতারের পশু-আকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে এরানে।

ভূমারার প্রস্তর মূর্তি প্রদর্শিত কক্ষাংশের সংলগ্ন কক্ষাংশটিতে মথুরায় প্রাপ্ত গুপ্তশৈলীর প্রভামণ্ডল শোভিত মহিমময় বুদ্ধমূর্তিটির (৩নং চিত্র,'গ') কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভূমারা মন্দিরের মূর্তিগুলি সূক্ষ্ম গুপ্তকলার বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। গুপ্তমূর্তিতে সচরাচর দৃষ্ট মুক্তা-যজ্ঞোপবীতধারী দ্বারপাল দুইটি [৩নং চিত্র, 'খ'] চমৎকার মূর্তি। ইহাদের কেশবিন্যাসে গুপ্তকলারীতি লক্ষণীয়। সুকুমার দেহসৌষ্ঠব, পেলবতা এবং লালিত্য প্রভৃতি গুপ্তকলার লক্ষণগুলি সবই ইহাতে বর্তমান। গণেশমূর্তিটিতে তাঁহার অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনগুলিতে দৃষ্ট লালিত্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নৃত্য ও ক্রীড়ারত সারিবদ্ধ গণমূর্তিগুলির বিবিধ ভঙ্গি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। একঘেয়েমি পরিহার করিয়া বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আনয়নে এবং প্রয়োজনমতো নব নব অলংকরণ ও প্রাচীর সজ্জারীতির উদ্‌ভাবনে গুপ্তকলাকারের অনায়াসপটুত্ব এই মূর্তিগুলি হইতে সহজেই প্রতিভাত হয়। চৈত্যগবাক্ষে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির মধ্যে বিশিষ্ট উত্তরভারতীয় পোষাক ও উচ্চ-পাদুকা পরিহিত সূর্যমূর্তিটি প্রাচীনতর কুষাণ-সূর্যমূর্তিগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই মূর্তিগুলি মধ্যপ্রদেশের ভূমারার এক শিবমন্দিরের ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংলগ্ন কক্ষাংশে এবং বিপরীত কক্ষাংশটিতে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে প্রভামণ্ডলশোভিত অথবা প্রভামণ্ডলব্যতীত দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিগুলি, একটি অনবদ্য বোধিসত্ত্ব-পদ্মপাণিমূর্তি, একটি তারামূর্তি এবং প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ বুদ্ধজীবনের প্রধান ঘটনাগুলি, যথা—তাঁহার জন্মলাভ, স্নান, গৃহত্যাগ, মারের আক্রমণ, বোধিলাভ,

ধর্মচক্রপ্রবর্তন, রত্নখচিত অবতরণিকায় স্বর্গ হইতে অবতরণ এবং তাঁহার মহাপরিনির্বাণ। সারনাথের এই মূর্তিগুলির কোনটিও এখানে পাওয়া ব্যাখ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের অনন্য মূর্তিটির সঙ্গে তুলনীয় নয় বটে, তবু ইহার অনেকগুলি মূর্তিই অতিশয় লালিত্যপূর্ণ।

সংলগ্ন কক্ষাংশটিতে বিভিন্নস্থানে পাওয়া গুপ্তযুগের বিবিধ মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। গুপ্তমন্দিরের বিশিষ্ট লক্ষণ তাহার তোরণদ্বার—যাহার একটি সুন্দর নিদর্শন এইস্থানে প্রদর্শিত আছে। তোরণের দ্বারপালিনীরূপে মকর ও কূর্মবাহিতা গঙ্গা ও যমুনা দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। বিহারের রাজাওনায় প্রাপ্ত স্তম্ভদুইটিতে অর্জুনের কৃচ্ছ্রসাধন এবং শিবের গঙ্গা আনয়নের দৃশ্য-দুইটিকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। রূপায়ণের বিশিষ্ট ভঙ্গির দিক হইতে নিদর্শন-দুইটি গুরুত্বপূর্ণ। একই প্রস্তরপটের উভয়পার্শ্বে খোদিত গণেশ ও কার্তিকেয় মূর্তি এই কক্ষাংশের আর একটি দ্রষ্টব্য। এখানে প্রদর্শিত গুপ্তযুগের অপরাপর মূর্তিগুলির মধ্যে আছে বুদ্ধের মার-আক্রমণের দৃশ্যটির জৈন-ভাষ্য, ক্রুদ্ধ গৃহস্বামীগণ পরিবেষ্টিত তীর্থঙ্কর, একটি সুগঠিত মহেশমূর্তি, রাহুসহ অন্যান্য নবগ্রহ মূর্তিখোদিত ফলকের অংশটি, একটি দিব্যকান্তি মহাপুরুষমূর্তি এবং একটি মিথুনমূর্তি।

মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য

বিপরীত কক্ষাংশটিতে উত্তর প্রদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি মধ্যযুগীয় মূর্তি সজ্জিত আছে। মধ্যযুগীয় শৈলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আছে মনোহর উমা-মহেশ্বর মূর্তিগুলি [৪নং চিত্র, 'গ'], মুণ্ডবিহীন দুইটি সুন্দর উপবিষ্ট মূর্তি, মুকুটধারী বুদ্ধ, একটি একমুখ-লিঙ্গ মূর্তি, পার্শ্বচরসহ একটি উন্নত-কায় সূর্যমূর্তি ছাড়াও অন্যান্য বিবিধ নিদর্শন।

উত্তর প্রদেশের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় বারাণসীর স্থানীয় শৈলীর মূর্তিগুলিতে। বারাণসীর মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় মহোবায় প্রাপ্ত সিংহনাদ এবং পদ্মপাণির মত মূর্তিগুলিতে, যেগুলি বিশেষভাবে এই শৈলীর লক্ষণাক্রান্ত। এই শৈলীর শিল্পীরা গুপ্ত ঐতিহ্যের উত্তরসূরী হইলেও এবং প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যযুগীয় মূর্তিগুলিতে গুপ্তকালীন সৌষ্ঠব ও সারল্যের স্পষ্ট আভাস থাকিলেও শেষ পর্যায়ের মূর্তিগুলিতে রীতি-অন্ধতা বা বাঁধা রীতির প্রয়োগ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, যাহা সমকালীন অন্যান্য মূর্তিরও সাধারণ লক্ষণ। এইগুলির মুখমণ্ডল বর্তুলাকার, জটামুকুট দীর্ঘতর, তীক্ষ্ণ চিবুক ও নাক, পদদ্বয়ের অনুপাতে হ্রস্ব দেহকান্ত; ইহাছাড়া অলংকরণের বাহুল্য এবং দেহের গড়নে ঋজু ও তির্যক রেখার প্রাধান্যও লক্ষণীয়। প্রতিটি পুরুষদেবতানির্বিশেষে প্রত্যেকের বুকেই চারিটি দলবিশিষ্ট কমলাকৃতি শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, এবং রূপশৈলীর ক্রমাবনতি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠা সত্ত্বেও মূর্তিগুলি সুদৃশ্য।

এই শৈলীতে নির্মিত বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রচুর মূর্তি সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র সারনাথ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এখানে পুরাতন বিষয়বস্তু নবরূপায়ণ-পদ্ধতিতে বিশিষ্টতা পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী, যথা বুদ্ধের নালগিরি দমনের দৃশ্যটির রূপায়ণে মূল মূর্তিটির আপেক্ষিক আয়তন অবশিষ্ট মূর্তিগুলি হইতে বৃহত্তর করিয়া দেখান হইয়াছে, যাহা প্রাচীনতর নিদর্শনগুলি হইতে ইহার পার্থক্য সূচিত করে। কিন্তু গুপ্ত ঐতিহ্যানুসারে প্রধান বিষয়বস্তুটির চতুর্দিকে অপরাপর ঘটনা যথা, বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন, স্বর্গ হইতে অবতরণ, সঙ্কিসায় আবির্ভাব ইত্যাদির অবতারণা তখনও প্রচলিত ছিল। মূল মূর্তিটির শীর্ষভাগের দুই পার্শ্বে স্তূপের স্থাপনা এবং বুদ্ধকে কখনও কখনও মুকুট এবং রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করার সুস্পষ্ট প্রবণতা এই

মধ্যযুগীয় শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যাহা বিহারে প্রাপ্ত সমকালীন মূর্তিগুলিতেও দৃষ্ট হয়। প্রভামণ্ডলে পদ্মপত্রের অলঙ্করণ গুপ্তকালীন বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান মূর্তির শীর্ষভাগের দুই পার্শ্বে শূন্যে বিচরণশীল গন্ধর্বমূর্তিতে প্রাচীনতর ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বর্তমান।

ইহার পরের চারিটি কক্ষাংশে বিহারে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় মূর্তিকলা প্রদর্শিত আছে। উত্তর প্রদেশের মত বিহারের মূর্তিগুলিও প্রাচীনতর গুপ্ত-মূর্তিকলারই ক্রমবিকশিত রূপ। বিহারের প্রাথমিক মধ্যযুগীয় মূর্তিগুলি সুনিশ্চিতরূপে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী প্রচলিত গুপ্ত-শিল্পঐতিহ্যের সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধযুক্ত। বিহার-শৈলীর অগণিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে নালন্দা, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ এবং কুর্কিহার নামক স্থানে। বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র নালন্দার বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ এবং শিল্পরীতির প্রভাব বৌদ্ধধর্মাশ্রিত প্রাচ্যের সর্বত্র এমনকি সুদূর যবদ্বীপ এবং সুমাত্রায়ও বিস্তৃত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের বুদ্ধমূর্তিগুলি গুপ্তকালীন মহিমময় বুদ্ধমূর্তিগুলিরই সমতুল্য। কিন্তু পরবর্তী মূর্তিগুলিতে রীতি-অন্ধতা দৃষ্ট হয়। সারনাথের গুপ্তমূর্তিগুলির মত এখানেও বুদ্ধের প্রধান মূর্তিটিকে ঘিরিয়া তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক ঘটনার সমাবেশ একটি লক্ষ্য করিবার মত বৈশিষ্ট্য। এই শৈলীতে নির্মিত বৌদ্ধ দেবদেবীর অগণিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে এবং এখানে তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে তারা, লোকেশ্বর, মঞ্জুবর, মারীচি এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিতে। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্রটি প্রায়ই এই সমস্ত মূর্তির উপর খোদিত থাকে। কখনও বা মূর্তিদাতার নাম এবং তাহার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ দেখা যায়। অলঙ্কার মণ্ডিত মুকুটধারী বুদ্ধ, বিহারশৈলীর মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে প্রায়শঃ দেখা যায়।

হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্তিও যথেষ্ট সংখ্যায় এখানে আছে, যাহার মধ্যে কয়েকটি বেশ বৃহদায়তন এবং সবগুলিই সৌষ্ঠবসহকারে গঠিত। হর-গৌরী, চক্র ও গদাদেবী সহ বিষ্ণু, বরাহ এবং বামন জনপ্রিয় দেব-দেবী মূর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। এই শৈলীর মূর্তিগুলির গঠন সর্বদাই স্থূল ও বলিষ্ঠ, কিন্তু সুদৃশ্য। যদিও বিহার ও বাঙ্গলা উভয় স্থানেই পাল-শৈলীর বিকাশ ঘটিয়াছিল, তথাপি শারীর সংস্থান এবং দেহের গঠনে বিহার-শৈলীর মূর্তিগুলি স্বকীয়তামণ্ডিত। মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার ও মুকুট, পুষ্পের অলঙ্করণ শোভিত পরিধেয় এবং নারী-কেশ-সজ্জার সুন্দর ভঙ্গি এই শৈলীর মূর্তিগুলির রমণীয় বৈশিষ্ট্য। এই স্থানের চারিটি কক্ষাংশে প্রস্তর এবং ধাতুময় মূর্তি প্রদর্শিত আছে। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটিতে ও তৃতীয়টির কিয়দংশে আছে বুদ্ধ, কয়েকটি বোধিসত্ত্ব ও তারা মূর্তি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবী। বাকী অংশে আছে হিন্দু দেবদেবী মূর্তি। বাহিরের বারান্দায় রক্ষিত আছে বিহারের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যশৈলীতে নির্মিত বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী মূর্তি, যাহার বিরাট কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে পৃথিবীদেবীকে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান বরাহ-মূর্তি এবং ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যে অপূর্ব নিদর্শন দুইটি মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্পকর্ম, যাহাতে গুপ্তকলার বৈভবের চিহ্ন তখনও বিদ্যমান। ইহার উপর উৎকীর্ণ বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র এবং উৎসর্গ লিপিটি উল্লেখযোগ্য; কারণ লিপির প্রাচীনত্ব মূর্তিগুলির কাল নির্ণয় করিতে সাহায্য করে। হিন্দু দেবদেবী মূর্তিগুলির মধ্যে সূর্যমূর্তির একটি অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন আছে। নাগ-নাগিনী মূর্তি দুইটি এবং রতি ও প্রীতি সহ মন্মথের মূর্তিটি উল্লেখযোগ্যভাবে সুসম্পাদিত এবং বিহারের মধ্যযুগীয় ভাস্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম।

সংলগ্ন কক্ষাংশ দুইটিতে বাংলার ভাস্কর্য-নিদর্শন প্রদর্শিত আছে। বাংলার মূর্তিকলার এই সংগ্রহটি বদান্য পণ্ডিত ডঃ বি, সি, লাহার

সৌজন্যে প্রাপ্ত। পালশৈলীর মূর্তিকলা, যাহার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে মগধ অঞ্চলে, নালন্দা, কুর্কিহার, বুদ্ধগয়া এবং অন্যান্য স্থানে, তাহারই আর এক সমান্তরাল বিকাশ ঘটিয়াছে বাংলাদেশে, যাহা আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। এই শৈলীর অপরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে দিনাজপুর, রাজসাহী, ঢাকা, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য স্থানে। মধ্য-যুগীয় শিল্পকলায় প্রাচীনতর গুপ্ত-ঐতিহ্যের পরিণতি ঘটিয়াছে পাহাড়-পুরের মূর্তি ও পোড়ামাটির ফলকগুলিতে। শ্রী ও ভূমি সহ বিষ্ণু এবং বাঁকুড়ার তীর্থঙ্করদের অপূর্ব মূর্তিগুলি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের অনুসারী। ভারতীয় সংগ্রহশালায় বৃহদায়তন বিষ্ণুমূর্তিগুলি ও লেখযুক্ত সদাশিব মূর্তিটি, রাজসাহী সংগ্রহশালার সূর্য, বিষ্ণু ও পার্বতীমূর্তি এবং ঢাকা-সংগ্রহশালার নটেশ, মৎস্যাবতার, ভ্রুকুটী, পর্ণশবরী, হেরুক ও অন্যান্য মূর্তিগুলি অপূর্ব। পালযুগের প্রস্তরময় মূর্তিগুলি প্রায় ধাতুময় মূর্তির মত মার্জিত ও তীক্ষ্ণ দেহরেখা সম্পন্ন [৪নং চিত্র, 'ক'] এবং শিল্পীর উচ্চাঙ্গের আঙ্গিক সাফল্যের পরিচায়ক। প্রদর্শিত বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীগণের মধ্যে সূর্য, বিষ্ণু, হরগৌরী, তারা এবং লোকনাথ মূর্তির প্রাধান্য লক্ষণীয়। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় পালশৈলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে শিবকে সর্বদাই উর্দ্ধরেতস্-মূর্তিরূপে দেখান হইয়াছে। নটেশরূপে তিনি বৃষের উপর নৃত্যরত। বিষ্ণুকে তাঁহার গদা-শংখ-চক্র ইত্যাদি আয়ুধগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর মত পদ্মের উপর ন্যস্ত অবস্থায় ধৃত দেখা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত, সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত বিষ্ণু প্রতিমায় বিশিষ্ট মহাযান প্রভাব লক্ষণীয়। কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে, যথা দেহের তনুতায়, মুখাবয়বের গড়নে এবং চোখের তির্যক সংস্থানে গৌড়ীয় রীতির মধ্যযুগীয় মূর্তিগুলির সঙ্গে নেপালী মূর্তির সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এখানে প্রদর্শিত রংপুরের ব্রোঞ্জমূর্তিগুলি ধাতুময় মূর্তির অতি উত্তম নিদর্শন। তাহাছাড়া, প্রস্তরময় মূর্তিরও একটি অপূর্ব সংগ্রহ এখানকার দুইটি কক্ষাংশে রক্ষিত আছে।

ভাস্কর্য-সম্পদে সমৃদ্ধ উড়িষ্যার অপূর্ব সমারোহময় মন্দিরগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, রাজারাণী মন্দির এবং কোনারকের সূর্য-দেউল অতুলনীয়। ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-ভূষার নিদর্শন দেখা যায় মুক্তেশ্বর মন্দিরে। রাজারাণী মন্দিরের দ্বারমণ্ডলের স্তম্ভে জড়িত নাগ-নাগিনীর মূর্তিগুলি ইহার অনুপম উদাহরণ। নাগ-নাগিনীর মূর্তিকে অলংকরণের উপাদানরূপে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে মুখলিঙ্গম, ভুবনেশ্বর এবং খিচিং-এর প্রাচীনতর মন্দিরগুলিতে। মধ্যযুগের ওড়িয়া ভাস্কর যে একাধারে বিপুলায়তন মূর্তি গঠনে এবং সূক্ষ্ম অলংকরণে সুপটু ছিলেন, তাহার প্রমাণ মেলে কোনারকের বিপুলায়তন হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যমূর্তিগুলিতে এবং রথচক্রের আরায় খোদিত সূক্ষ্ম অলঙ্করণ-গুলিতে। খজুরাহো প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থানের মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলির মত উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিও শৃঙ্গার বিষয়ক। কামশাস্ত্রে বর্ণিত বিবিধ 'বন্ধ' গুলি এখানে রূপায়িত হইয়াছে। উড়িষ্যার মূর্তি-গুলির গঠন অত্যন্ত সুদৃশ্য, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, বলিষ্ঠ অথচ সুকুমার। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যেমন ঊর্দ্ধরেতঃ শিবমূর্তিতে বাংলা ও উড়িষ্যার ভাস্কর্যের সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়; কিন্তু কতকগুলি বৈসাদৃশ্য এই দুইটি শৈলীর পার্থক্য সূচিত করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর অপূর্ব নিদর্শন উড়িষ্যা হইতে পাওয়া গিয়াছে। জাজপুরের মাতৃকামূর্তিগুলি, ললিতগিরির বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলি এবং ভুবনেশ্বরের নারীমূর্তিগুলি কিছুটা খজুরাহো ও বিন্ধ্যপ্রদেশের [৫নং চিত্র, 'ক'] অন্যত্র প্রাপ্ত রমণীয় মূর্তিগুলির সমতুল্য এবং উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় মূর্তিকলার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উড়িষ্যা-শৈলী হইতে ভিন্নতর আর একটি শৈলীর অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ময়ূরভঞ্জে [৫নং চিত্র, 'গ']। এখানে একটি কক্ষাংশে এবং বারান্দার কিছু অংশে উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় মূর্তিকলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মধ্যভারতের উদয়গিরি এবং অন্যান্য স্থানের মূর্তিগুলি গুপ্ত

ঐতিহ্যমণ্ডিত। মধ্যভারতের মধ্যযুগীয় যোগিনী মন্দিরগুলির মধ্যে ভেড়াঘাটের চৌষট্টি যোগিনীর মূর্তিগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য প্রতিমা দেখা যায়। সরল সুগঠিত ও সুষমামণ্ডিত মূর্তিগুলিতে, পদ্মপত্র অঙ্কিত প্রভামণ্ডলে এবং মুক্তার সজ্জায় প্রাচীনতর গুপ্ত ঐতিহ্য স্পষ্টতঃ লক্ষণীয়। মধ্যভারত এবং উত্তরপ্রদেশের মূর্তিগুলিতে কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য দেখা যায় এবং উভয়ের বৈশিষ্ট্যে প্রচুর মিল আছে। দেবপ্রতিমার বুকে রুহিতনাকৃতি চিহ্ন উভয় শৈলীর মূর্তিতেই দৃষ্ট হয়। খজুরাহো মন্দিরগুলির প্রাচীরসজ্জায় মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা ও অলঙ্করণের বৈচিত্র্য দর্শনীয়। এখানকার মিথুনমূর্তিগুলি কেবল মাত্র পুরী ও ভুবনেশ্বরের মূর্তিগুলির সঙ্গে তুলনীয়। মধ্যভারতের প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যযুগীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় ললিতপুরের মন্দিরের ত্রিবিক্রম মূর্তি এবং ভেড়াঘাটের যোগিনী মূর্তিগুলি হইতে, এবং শেষ পর্যায়ের শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় খজুরাহোর মন্দিরগাত্রের মূর্তিগুলি হইতে। মধ্যভারতের চন্দেল্ল রাজারা যে প্রধানতঃ হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ছিলেন, মন্দির ও মূর্তিগুলি হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। এখানকার একটি কক্ষাংশে প্রদর্শিত মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যমণ্ডিত দুইটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, সাত্‌নার কয়েকটি যোগিনীমূর্তি [৫নং চিত্র, 'খ'] এবং ঘন আলিঙ্গনাবদ্ধ নাগ-দম্পতীমূর্তি মধ্যযুগীয় কলাশৈলীর উদাহরণ-বিশেষ।

আইহোলি, বাদামী এবং পট্টডকলের প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় মূর্তিকলা প্রাচীনতর গুপ্ত ঐতিহ্যের স্মারক। বাদামীর মূর্তিগুলি কিছুটা গুরুভার, কিন্তু পট্টডকলেরগুলি আরও সুকুমার। ইলোরার কৈলাসমন্দিরের চালুক্য-শৈলীতে নির্মিত রাষ্ট্রকূট রাজাদের ভাস্কর্যগুলি উন্নততর নিদর্শন। কানাড়ী জেলাগুলিতে প্রাপ্ত শেষপর্যায়ের চালুক্য শিল্পকলায় এই শৈলীর অধিকতর উন্নতি দৃষ্ট হয়। পত্রসজ্জার চন্দ্রাতপ, মেঘমণ্ডল, রত্নখচিত

মুকুট ও অলঙ্কার, প্রলম্বিত প্রভামণ্ডল প্রভৃতি এই শৈলীর বৈশিষ্ট্য। চালুক্য শিল্পশৈলীর স্থানীয় বিকাশ ঘটিয়াছিল হিমাবতী, মহীশূর এবং হায়দারাবাদের পূর্বাঞ্চলে, যথাক্রমে নোলম্ব, হোয়সল এবং কাকতীয়-শৈলীতে। মহীশূরের হালেবিড় ও বেলুড় এবং হায়দারাবাদের বরঙ্গল ও পালামপেটের বন্ধনীমূর্তিগুলি হোয়সল এবং কাকতীয় শিল্পশৈলীর অপরূপ নিদর্শন। হোয়সল ভাস্কর্যে অলঙ্করণের প্রাচুর্য ভারতীয় শিল্পে অতুলনীয় এবং এই শিল্পশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য [৭নং চিত্র, 'ক']। এখানকার একটি কক্ষাংশে শেষ পর্যায়ের চালুক্য ও হোয়সল ভাস্কর্যের নিদর্শনস্বরূপ দক্ষিণভারত হইতে আনীত কয়েকটি মূর্তি প্রদর্শিত আছে। শেষোক্ত শৈলীর মূর্তিসংগ্রহটি মহীশূর রাজ্যের বদান্যতায় প্রাপ্ত।

যবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশের সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় অব্দের শুরু হইতেই এবং হিন্দুরাজা পূর্ণবর্মনের খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পল্লব-অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত লেখটি ভারতীয় উপদ্বীপের সঙ্গে এই দ্বীপটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ দেয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক হইতে মধ্য-যবদ্বীপের স্থাপত্যে দক্ষিণভারতের সুগভীর প্রভাব দেখা যায়। কম্বোজের প্রাচীন ব্রোঞ্জ্ মূর্তিগুলির সঙ্গে অমরাবতীর ব্রোঞ্জ্ বুদ্ধমূর্তি-গুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। নাগপট্টনমের প্রাচীন ব্রোঞ্জ্ মূর্তিগুলিতে যবদ্বীপশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। নালন্দার মগধ-শিল্পকলা, দক্ষিণ-ভারতের পল্লব ও চোল-শিল্পকলা এবং যবদ্বীপ-শিল্পকলার পারস্পরিক তুলনায় বোঝা যায় যে, এই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল। প্রারম্ভিক পর্যায়ের যবদ্বীপ-শিল্পকলায় গুপ্ত ও পল্লব-শৈলীর প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। দিয়েঙ্ মালভূমিতে প্রাচীনতর ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি দেখা যায়। প্রচুর অলঙ্কারমণ্ডিত চণ্ডীকলসন এবং চণ্ডীসিউ মন্দির দুইটি খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকের শৈলেন্দ্র-যুগের। কেডু সমতলভূমিতে চণ্ডী বরবুদুর স্তূপটি বাহাত্তরটি

ছোট ছোট স্তূপবেষ্টিত একটি স্তরিত পিরামিডের মত, যাহার চূড়াদেশ আর একটি স্তূপ দ্বারা গঠিত। প্রদক্ষিণপথের প্রাচীরে বুদ্ধের জীবনী এবং অবদানের কাহিনীগুলি অতি অপূর্বভাবে রূপায়িত। প্রম্বননের চণ্ডী লোরো জংরাং একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির, যাহার বারান্দার স্তম্ভগুলিতে রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ কাহিনীগুলি উৎকীর্ণ আছে।

কম্বোজের খেমের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় আঙ্কর-থন্-এর বিরাট বাঁধানো সড়কটিতে, যাহার নাগমূর্তি উৎকীর্ণ প্রাচীর ধারণ করিয়া আছে দেব এবং অসুর মূর্তিগুলি, ইহাছাড়া ত্রিদ্বার-তোরণগুলি, গরুড়ধৃত স্তম্ভগুলি, চতুর্দিকে মনুষ্য-মুখোস সজ্জিত বিরাট চূড়াগুলি এবং বড় বড় চৌখুপিতে উৎকীর্ণ মহাকাব্যের আখ্যানগুলি, যাহার অঙ্কন-শৈলীতে ভাস্কর্যগুণ অপেক্ষা চিত্রধর্মিতা লক্ষণীয়। মধ্য-যবদ্বীপের সুকুমার একক মূর্তিগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালের কম্বোজ-শিল্পের ক্রমপুঞ্জীভবনের বিপরীত রীতিটি তুলনীয়। এখানে যবদ্বীপ-মূর্তিকলার কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন [৭নং চিত্র, 'খ'] এবং কম্বোজের একটি সুন্দর গরুড়মূর্তিসহ [৭নং চিত্র, 'গ'] আরও কয়েকটি বিবিধ মূর্তি রক্ষিত আছে।

দক্ষিণ বারান্দা

বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য

গুপ্ত ভাস্কর্যকক্ষের সংলগ্ন দক্ষিণের বারান্দায় উড়িষ্যা ও বিহারের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি সজ্জিত আছে। উড়িষ্যার মূর্তিগুলির মধ্যে ললিতগিরির বোধিসত্ত্বমূর্তি, তারামূর্তি, কোনারকের একটি বৃহৎ ভগ্ন সূর্যমূর্তি এবং ভুবনেশ্বরের ভৈরবমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব ও পশ্চিম বারান্দা

স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ

পূর্ব বারান্দায় বিহার, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রাপ্ত স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে আছে মকরমুখো পয়ঃপ্রণালী, অলংকরণ মণ্ডিত দ্বারপথ, নবগ্রহ ও দশাবতার-মূর্তি-উৎকীর্ণ দ্বারপথের অংশ বিশেষ, হস্তীমূর্তি-উৎকীর্ণ ভাস্কর্যভূষা, অশ্ব ও অন্যান্য পশুমূর্তি-উৎকীর্ণ মন্দিরভিত্তির অংশ ও স্তম্ভ। বাংলাদেশে প্রাপ্ত একটি সুন্দর দ্বারপথের অংশবিশেষে সস্ত্রীক ব্রহ্মার মূর্তি ইহাকে একটি ব্রহ্মামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রূপে চিহ্নিত করে। ব্রহ্মামন্দির সাধারণতঃ অতি বিরল। বাংলাদেশে প্রাপ্ত একটি মকর-মুখো পয়ঃপ্রণালী, অতি সুন্দর অলংকরণ মণ্ডিত একটি সুউচ্চ স্তম্ভ (সম্ভবতঃ ইহাও বাংলাদেশে প্রাপ্ত) এবং নাগমূর্তি ও অন্যান্য অলংকরণ-যুক্ত গুপ্তযুগের একটি তোরণদ্বার উল্লেখ যোগ্য নিদর্শন।

পশ্চিম বারান্দায় প্রদর্শিত অনুরূপ কয়েকটি স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষের মধ্যে নর্তক ও বাদকদল খোদিত স্তম্ভ দুইটি এবং ভারহুতের কয়েকটি ভগ্নাবশেষ উল্লেখনীয়।

দ্বিতল বারান্দা

ভারতীয় দেবদেবীমূর্তি এবং লিপির ক্রমবিকাশ

দ্বিতলের বারান্দাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একদিকে কয়েকটি নির্বাচিত মূর্তির সাহায্যে দেব-প্রতিমার ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে প্রদর্শিত মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্তি যথাযথ স্থানে দেখান হইয়াছে এবং কালানুক্রম নির্দেশ করিবার জন্য বিভিন্ন রং ব্যবহার করা হইয়াছে। মানচিত্রের নিম্নে পরিচয় লিপিতে লিখিত ব্যাখ্যানের উদাহরণ স্বরূপ মূল নিদর্শনের সঙ্গে প্লাস্টারের প্রতিকৃতি ও আলোকচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এইগুলির পরে ব্রাহ্মী ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় লিপি এবং নাগরী, বাংলা, গ্রন্থ-তামিল, তেলুগু এবং কানাড়ী প্রভৃতি পরবর্তীকালীন লিপি-গুলির ক্রমবিকাশের ধারা তালিকাবদ্ধভাবে প্রদর্শিত আছে এবং তালি-কার নিকটে স্থিত মানচিত্রদ্বারা যে লিপি যে সমস্ত অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ছিল, তাহারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহারও পরে দেখান হইয়াছে বহির্ভারতে ভারতীয় লিপির বিকাশ এবং কত দূরে ও কতগুলি দেশে ভারতীয় লিপি বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাও একটি মানচিত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতীয় দেবদেবীমূর্তির ক্রমবিকাশে স্থান ও কালের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। এই স্থানে প্রদর্শিত কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ

হইতে এই কৌতূহলপূর্ণ বিষয়বস্তুটির ব্যাপকতা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের ও বিভিন্ন অঞ্চলের অভিন্ন দেবমূর্তির মধ্যে যদিও মূলগত ঐক্য বর্তমান, তবুও কয়েকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য স্থান ও কালের পার্থক্য সূচিত করে।

গণেশ—গুপ্ত ও প্রাথমিক মধ্যযুগের গণেশমূর্তি মুকুট বিহীন। তাঁহার প্রাচীন মূর্তিগুলি সাধারণতঃ দুইটি হাত এবং স্বাভাবিক হস্তী-মুণ্ড যুক্ত। উত্তর ভারতের যথা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় মূর্তিকলায় গণেশকে জটামুকুট যুক্ত এবং একটি পাত্র হইতে মোদক ভোজনরত দেখা যায়। উড়িষ্যায় জটামুকুটের পরিবর্তে কখনও কখনও কুণ্ডলায়িত কেশ দেখা যায়। দক্ষিণভারতের মধ্য-যুগীয় তামিল ভাস্কর্যে দেখা যায় করণ্ডমুকুট, যাহা দেখিতে প্রায় উপর্যুপরি সাজানো ভাণ্ডের মত। তাঁহার প্রলম্বিত শুঁড়টি উদরের উপর দিয়া কুণ্ডলীকৃত হইয়া বাম হস্তে ধৃত মোদকটিকে স্পর্শ করিয়াছে। কানাড়ী অঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যে মুকুটটি অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পাত্রস্থিত মোদকগুলি গ্রহণের জন্য শুঁড়টি আরও বেশী সমান্তরাল ভাবে প্রলম্বিত।

সূর্য—খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকে সূর্য উষ্ণীষধারী এবং চারিটী অশ্ববাহিত রথে সমাসীন। গুপ্তকালীন সূর্যকে মুকুটধারী রূপে, তরবারি হস্তে, অঙ্গরাখা ও পাদুকা পরিহিত অবস্থায়, অনুচারী দণ্ড ও পিঙ্গলসহ দেখান হইয়াছে। রাজস্থান হইতে বাংলাদেশ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে তিনি অনুরূপ পোষাক পরিহিত, কিন্তু সাতটি অশ্ব বাহিত রথারূঢ়। দক্ষিণভারতীয় মূর্তিতে সূর্যকে নগ্নপদ, পোষাক বিহীন এবং সাধারণতঃ অনুচর বিহীন অবস্থায় দেখান হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যীয় ভাস্কর্যে সূর্যকে উত্তর ভারতীয়

প্রথায় অনুচরসহ এবং উভয় পার্শ্বে তীর ও ধনুর্ধারিণী মূর্তিসহ দেখা যায়।

ব্রহ্মা—গুপ্ত ভাস্কর্যে ব্রহ্মাকে যুবকরূপে দেখান হইয়াছে; কিন্তু মধ্যযুগের উত্তর ভারতীয় ভাস্কর্যে দেবতাদের পিতামহরূপে তাঁহার পিতামহ নাম সার্থক করার জন্য তাঁহাকে শ্মশ্রুমণ্ডিত ও স্ফীতোদররূপে রূপায়িত করা হইয়াছে। বাংলাদেশে তাঁহাকে কখনও শ্মশ্রুমণ্ডিত, কখনও বা শ্মশ্রুবিহীনরূপে, কিন্তু সর্বদাই স্ফীতোদররূপে দেখান হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যীয় অঞ্চলে উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের তামিল অঞ্চলে অন্যান্য যে কোন দেবতার মত সুন্দর ও যুবকান্তিরূপে তাঁহাকে দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মাকে বস্ত্র এবং অজিন-যজ্ঞোপবীত পরিহিত অবস্থায়ও দেখা যায়।

বিষ্ণু—যদিও বিষ্ণুর চব্বিশটি রূপ সর্বত্রই জ্ঞাত, তবুও উত্তর ভারতে তাঁহার ত্রিবিক্রম রূপ এবং দক্ষিণ ভারতে বাসুদেব রূপটিই সমধিক প্রিয়। গুপ্ত ভাস্কর্যে বিষ্ণুকে সাধারণতঃ দেখা যায় আয়ুধ-পুরুষসহ অর্থাৎ তাঁহার আয়ুধগুলি মানুষ রূপে কল্পিত ও রূপায়িত। যদিও পরবর্তীকালীন মূর্তিতে প্রকৃত আয়ুধগুলির রূপায়ণই অধিক প্রচলিত হয়। আয়ুধ-পুরুষ, বিশেষতঃ চক্রপুরুষ ও গদাদেবী স্থাপনার ঐতিহ্য মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করিয়াও পরবর্তী কিছুকাল বাংলাদেশ ও বিহারে অনুসরণ করা হইত; দাক্ষিণাত্যের প্রাথমিক চালুক্যীয় ও পল্লবীয় ভাস্কর্যেও অনুরূপ রীতি দেখা যায়। উত্তর ভারতীয় ভাস্কর্যে বনমালা বিষ্ণুর একটি আবশ্যিক এবং স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য।

বিষ্ণুমূর্তিতে শ্রীবৎস-চিহ্ন উত্তর ভারতীয় ভাস্কর্য অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যে স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। কারণ, ইহা গুপ্তমূর্তি

কলায় কদাচিৎ দেখা গেলেও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যযুগীয় মূর্তিতে কোথাও দেখা যায় না। শ্রীবৎস-চিহ্নের আকৃতিও স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন। উত্তর ভারতীয় মূর্তিতে ইহা বুকের মধ্যভাগে এবং দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে দক্ষিণ ভাগে দেখা যায়। বিষ্ণুর আয়ুধগুলি আকারে ও অলংকরণে স্থান ভেদে পৃথকরূপ ধারণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে যথাক্রমে খটকামুখ এবং করতারীমুখ হস্তের পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববাংলার মূর্তিতে দেখা যায়, তাঁহার ধৃত আয়ুধগুলি পদ্মের উপর স্থিত যাহা স্পষ্টতঃই বৌদ্ধ প্রভাব জাত। দক্ষিণ ভারতে তাঁহাকে শ্রী ও ভূদেবী সহ দেখা যায়। উত্তর ভারতে তাঁহার সহিত থাকেন শ্রী ও সরস্বতী।

বিষ্ণুমূর্তিগুলি স্থান, আসন, শয়ন এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি বিশিষ্ট রূপের মূর্তিগুলিতে পার্থক্য এবং সাদৃশ্য দুই-ই বর্তমান; কিন্তু বিষ্ণুর শয়ন মূর্তিতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতীয় মূর্তিতে সর্পশয্যা-শেষনাগের দেহ আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে রচিত। কিন্তু আদি দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে তাহার দেহ কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রচিত; এবং এই অঞ্চলের পরবর্তীকালীন ভাস্কর্যে দেখা যায়, উপরে শায়িত বিষ্ণুমূর্তির সম্পূর্ণ দেহটিকে ধারণ করিয়া আছে এই কুণ্ডলী।

দশাবতার—বিষ্ণুর দশাবতারমূর্তি একত্রে প্রদর্শন করার রীতিটি উত্তরভারতেই অধিকতর জনপ্রিয় এবং স্থাপত্যের অংশ বিশেষে সারি-বদ্ধ দশাবতারের মূর্তি খোদিত দেখা যায়। চালুক্যীয় ভাস্কর্যে এই ঐতিহ্য অনুসৃত হইতে দেখা যায়, যেখানে পত্রপুষ্প রচিত চন্দ্রাতপে খোদিত থাকে দশাবতারের মূর্তি এবং পশ্চাদপটে থাকে বিষ্ণুমূর্তি।

বরাহ—বিষ্ণুর বরাহ-অবতার দুই প্রকারে রূপায়িত হইয়াছে—কখনও সম্পূর্ণ বরাহরূপে, কখনও বা বরাহ-মুণ্ডধারী মনুষ্যমূর্তিরূপে। উত্তরভারতীয় ভাস্কর্যে উভয়বিধ রূপই দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ মধ্য ভারতের এরান এবং উদয়গিরি গুহায় আদি গুপ্ত যুগের ও পরবর্তী কালের বরাহ অবতার মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কেবল মাত্র শেষোক্ত রূপটিই প্রচলিত এবং পশু রূপটি অনুপস্থিত।

শিব—উত্তর ভারতীয় ভাস্কর্যে শিবকে দেখা যায় শূল-অক্ষমালা-সর্প সহ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে তাঁহাকে কুঠার ও হরিণ সহ দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে তাঁহাকে অবশ্যম্ভাবী রূপে মকর ও পত্রকুণ্ডল সহ দেখান হয়। দ্বিভুজ-শিবমূর্তি উত্তর ভারতীয় মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে দেখা যায়; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র আদি গুডিমল্লম মূর্তিতে বর্তমান।

শিব ও পার্বতি—শিবকে পার্বতীসহ দেখা যায় উমামহেশ্বর রূপে যেটি উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় রূপ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সোমস্কন্দ রূপটিই অধিকতর জনপ্রিয়। উত্তর ভারতের হরগৌরী মূর্তিগুলিতে সর্বদাই উপবিষ্ট শিবকে পার্বতীর সঙ্গে প্রণয় লীলায় রত অবস্থায় দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ ভারতের সোমস্কন্দ মূর্তি মধ্যস্থলে শিশু স্কন্দসহ জনক জননীর একটি শান্ত পারিবারিক চিত্র। উত্তরপূর্ব ভারতীয় মূর্তিতে শিবকে উর্দ্ধরেতস্ রূপে এবং নগ্ন অবস্থায় দেখান হইয়াছে, যে বৈশিষ্ট্যটি দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে অনুপস্থিত। দ্বিভুজ শিব উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যেও দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কেবল মাত্র আদি গুডিমল্লম মূর্তিতে।

ভৈরব-গজান্তক-অন্ধকান্তক—উত্তর ভারতীয় শিবমূর্তিতে গজান্তক, ভৈরব এবং অন্ধকান্তক রূপের যে কোন দুইটি অথবা তিনটির

সমন্বয় ঘটিয়াছে ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই তিনটি রূপলক্ষণকে পৃথক ভাবে দেখান হইয়াছে, এবং প্রতিটি রূপের মূর্তি স্বতন্ত্র। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য অঞ্চলে এই বিভিন্ন রূপগুলির সমন্বয় দেখা যায় ইলোরায়।

নটেশ—নটেশ রূপে শিব বহুভুজ বিশিষ্ট, এবং উড়িষ্যার ভাস্কর্যে তিনি নন্দীর পাশে ললিত অথবা চতুর ভঙ্গিতে নৃত্যরত। পূর্ব বাংলার মূর্তিতেও তিনি বহুভুজ ও অনুরূপ ভঙ্গিতে নন্দীর পৃষ্ঠোপরি নৃত্যরত। উত্তর প্রদেশে এবং মধ্যভারতে বহুভুজের ঐতিহ্য বর্তমান, কিন্তু উড়িষ্যার মত নন্দীর অবস্থান দেবমূর্তির পার্শ্বে। দক্ষিণ ভারতে শিব চতুর্ভুজ এবং একটি বামনমূর্তির উপর আনন্দতাণ্ডব ভঙ্গীতে নৃত্যরত। উত্তর ভারতীয় মূর্তিতে কখনও কখনও নটেশ ও বীণাধর রূপের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

কল্যাণসুন্দর—কল্যাণসুন্দর বা শিব-পার্বতীর বিবাহমূর্তি তিনটি বিভিন্ন রূপে দেখান হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিবকে পার্বতী সম্প্রদানের রূপটিই সাধারণ রূপ। এলিফ্যান্টার গুহাগাত্রের প্রাচীনতর মূর্তিতে দেখা যায়, হিমবান শিবের হস্তে পার্বতীকে সম্প্রদান করিতেছেন ; কিন্তু পরবর্তী কালের মূর্তিতে, যথা, মাদুরাই মন্দির গাত্রের মূর্তিতে দেখা যায় বিষ্ণু তাঁহাকে সম্প্রদান করিতেছেন। দুইটিই পাণি-গ্রহণ রূপের মূর্তি। সপ্তপদী রূপের মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মূর্তিতে হোমকুণ্ডের পাশে শিবের জীবন সঙ্গিনী রূপে পার্বতীকে তাঁহার সম্মুখে দেখা যায়।

অর্ধনারীশ্বর—অর্ধনারীশ্বর রূপে শিবের সাধারণতঃ চারটি কখনও বা তিনটি হাত দেখা যায়। এখানে একটি বহুভুজ বিশিষ্ট মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বিরল। তামিল অঞ্চলের আদি পল্লবমূর্তিগুলি চতুর্ভুজ এবং স্বাভাবিক ও সুদৃশ্য দেহসৌষ্ঠব সম্পন্ন ; কিন্তু

আদি চোল মূর্তিতে শিব-অর্ধের দুইটি এবং দেবী-অর্ধের একটি হস্ত সুন্দর ত্রিভঙ্গ ভাবে বিন্যস্ত। পরবর্তী মূর্তিগুলিতে চতুর্ভুজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু পুরুষ ও নারী হস্তের গঠন বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিরল দেবমূর্তির নিদর্শন স্বরূপ উড়িষ্যার একটি একপাদ মূর্তি এখানে রক্ষিত হইয়াছে।

সপ্তমাতৃকা এবং নবগ্রহ—কুষাণ ভাস্কর্যে শিশুক্রোড়ে স্বাভাবিক দর্শন বরাহী এবং চামুণ্ডা সহ সপ্তমাতৃকা মূর্তি দেখা যায়; প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যযুগীয় মূর্তিতে এই বৈশিষ্ট্য বলবৎ থাকে। কিন্তু পরবর্তী কালে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিগুলিতে বরাহীর মুখমণ্ডল একটি বরাহের আকৃতি ধারণ করে এবং চামুণ্ডাকে কৃশকায়া রূপে দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় তামিল মূর্তিগুলিতে মুণ্ডমালা, সর্পের বক্ষাবরণ এবং অগ্নিশিখ জটা ছাড়া চামুণ্ডা স্বাভাবিক আকৃতির।

দক্ষিণ ভারতের নবগ্রহের মূর্তিগুলি বেশীর ভাগই চতুর্ভুজ এবং বিভিন্ন অবস্থানে স্থিত। দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যে এই মূর্তিগুলি দ্বিভুজ এবং সারিবদ্ধ ভাবে অবস্থিত দেখা যায়; কেবল চন্দ্রগ্রাসকারী রাহুর শুধু মাত্র বৃহদাকার মুখমণ্ডল সহ দুইটি হাত দেখা যায়।

তীর্থংকর—আদি-কুষাণ ভাস্কর্যে তীর্থংকর মূর্তির বুকে শ্রীবৎস-চিহ্নসহ অন্যান্য মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখান হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীবৎস-চিহ্নটি পরিবর্তিত আকারে, এক বাংলাদেশ ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যযুগীয় মূর্তিতে বর্তমান ছিল। দক্ষিণ ভারতের তীর্থংকর মূর্তিতে ইহা অবর্তমান, যদিও ভিন্ন আকারে এই চিহ্নটি বিষ্ণুমূর্তির বুকের দক্ষিণ ভাগে বর্তমান দেখা যায়।

বুদ্ধ—বিভিন্ন শতকের বুদ্ধমূর্তিতে উষ্ণীষগত পার্থক্য সূচিত করা যায়। গান্ধার রীতির উষ্ণীষ তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধা। আদি-কুষাণ রীতিতে হয় মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত, কেবল কপালের প্রান্তদেশে কেশগুচ্ছের আভাস স্বরূপ একটি রেখামাত্র থাকে, কিম্বা মাথার উপর একটি মাত্র বামাবর্ত কেশগুচ্ছ দেখা যায়। গুপ্তরীতির উষ্ণীষ অতি সুদৃশ্য; মাথার মধ্যস্থলের স্ফীতিটি সুন্দর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ দ্বারা আবৃত। মধ্যযুগীয় মূর্তিতে বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে এই স্ফীতির উপর একটি অগ্নি-শিখা দেখা যায়।

এই অংশ হইতে বারান্দার অপর যে অংশে যাওয়া যায় সেখানে দেখান হইয়াছে ভারতে ও বহির্ভারতে ভারতীয় লিপির ক্রমবিকাশের ধারা।

বহির্ভারতে ভারতীয় লিপি—এখানে প্রথম কক্ষাংশে বহির্ভারতের মালয়, তিব্বত ইত্যাদি স্থানের কয়েকটি লিপি-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শন আধারে সজ্জিত লেখের আলোকচিত্রগুলি বিরাট তালিকাগুলির সাহায্যে বোধগম্য হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের লিপি কিরূপে সুদূর তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, আন্নাম এবং জাভায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও সুস্পষ্ট হয়।

তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার বালুকায় প্রোথিত পুঁথি এবং দলিলগুলির লিপির সঙ্গে উত্তরকালীন গুপ্ত লিপির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে পূর্বোক্ত লিপি গুপ্ত লিপি হইতে উদ্ভূত। তিব্বতী লিপিও গুপ্তলিপি হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্মদেশের খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের লিপি কৃষ্ণা নদীর উপত্যকার প্রাচীনতর লিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এমন কি,

সপ্তম শতাব্দীর লিপিতেও ভারতীয় লিপির আকৃতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। সিংহলের প্রাচীনতম লিপিটি ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি এবং তামিল জেলাগুলির প্রাচীন গুহালিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের সিংহলী লেখে গ্রন্থ এবং বট্টেলুট্টুর প্রভাব সহজেই দেখা যায়। কম্বোজ এবং আন্নামের প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় শতকগুলির লিপি ব্রাহ্মী এবং ইহারই অষ্টম শতকের ক্রমবিকশিত রূপটি অনুরূপভাবে উদ্ভূত কৃষ্ণা-উপত্যকার লিপি এবং পল্লব লিপির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। মালয়ের খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের একটি লেখ লিপি-পদ্ধতির দিক হইতে বিশুদ্ধ ভারতীয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের যবদ্বীপ ও বোর্ণিওর লিপি সমসাময়িক পল্লব লিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত।

ব্রাহ্মী—পরবর্তী অংশে প্রাচীনতম কাল হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মী লিপির ক্রমবিকাশ কয়েকটি মূল নিদর্শন এবং বিরাট একটি তালিকা সহযোগে দেখান হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীনতম লিপি হিসাবে মহেন্‌জোদাড়োয় প্রাপ্ত সীল মোহরের উপর উৎকীর্ণ বিচিত্র প্রতীক গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহার অর্থ এখনও পর্যন্ত দুর্বোধ্য। ঐতিহাসিক যুগের ঊষাকাল হইতে দেশের সর্বত্র ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। ভারতের সর্বত্র একই লিপিতে উৎকীর্ণ অশোকের শিলালেখগুলি হইতে ভারতবর্ষের মূলগত ঐক্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু স্থান বিশেষে ইহার পার্থক্যও দৃষ্ট হয়; যেমন কৃষ্ণা উপত্যকার ভট্টিপ্রলু শিলালেখগুলি এবং সুদূর দক্ষিণ প্রান্তের তামিল গুহালেখগুলি। এই লিপির ক্রম-বিকাশ আরও অন্যত্র দেখা যায়, যথা উত্তর ভারতে শুঙ্গ, কলিঙ্গ ও কুষাণ শিলালেখ গুলিতে, এবং দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে সাত-বাহন ও ইক্ষ্বাকুদের লেখগুলিতে। ইক্ষ্বাকু লেখগুলিতে লিপিগুলি

প্রলম্বিত আকারের এবং অলংকার মণ্ডিত। দক্ষিণ ভারতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের আদি-পল্লব প্রাকৃত লেখের আরও কিছুটা ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং উত্তর ভারতে সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে প্রাচীনতর কুষাণ কালীন লিপির ক্রমবিকশিত রূপ দেখা যায়। গুপ্ত লিপির উত্তর ভারতীয় রূপ মধ্য ও পশ্চিম ভারতীয় রূপ হইতে ভিন্নতর। এরানে প্রাপ্ত লেখের লিপিগুলি ত্রিভুজ শীর্ষক। যাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল মধ্যভারতের বাকাটক লিপিতে।

নাগরী—পরবর্তী অংশে প্রাচীনতর ব্রাহ্মীলিপি হইতে নাগরী লিপির ক্রমবিকাশ [১০ নং চিত্র] এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তাহার ব্যবহার দেখান হইয়াছে। শেষোক্ত অঞ্চলে অধিকতর ব্যবহৃত স্থানীয় লিপিগুলিও দেখান হইয়াছে।

শুঙ্গ লিপি উত্তর ভারতে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনের বিভিন্ন লিপি-গুলি হইতে এবং কুষাণ লিপি মথুরার অতি প্রাচীন লিপিগুলি হইতে জাত হইয়াছে। কুষাণ লিপির সহিত সমসাময়িক ক্ষত্রপ এবং সাত-বাহন লিপির অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান, এবং এই কুষাণ লিপিই গুপ্ত লিপির উত্তর ভারতীয় রূপের পূর্বসূচনাকারী, যাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি। যে লিপিটি নাগরী লিপিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের যশোধর্মনের প্রশস্তির কুটিল লিপিতে তাহার ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং এই লিপিরই আরও ক্রমোন্নত রূপ—নাগরী রূপ দেখা যায় হর্ষবর্ধনের লেখে। এই সময় হইতে পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে কেবল মাত্র নাগরী লিপিই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে কখনও কখনও স্থানীয় লিপির সঙ্গে ব্যবহৃত হইত। উত্তর ভারতে, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে এই লিপির ক্রমবিকাশ দেখা যায় প্রতিহার গাহারবাল, পরমার এবং

চণ্ডেল্লদের লেখগুলিতে এবং বাংলাদেশে পাল ও সেন রাজাদের লেখ-গুলিতে (স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত)। দক্ষিণ ভারতে নাগরী লিপির ক্রমবিকাশ দেখা যায় কদাচিৎ প্রাপ্ত পল্লব এবং পশ্চিমী চালুক্যগণের নাগরীলেখে ও অপেক্ষাকৃত সচরাচর দৃষ্ট রাষ্ট্রকূট নাগরীলেখে; এবং যাদবদের নিয়মিত নাগরীলেখে, যাহার পরিণতি ঘটিয়াছিল বিজয়নগরের নাগরীলেখে। বিজয়নগরের তাম্রদানপত্রগুলি বেশীর ভাগই নন্দী-নাগরী নামে পরিচিত বর্তুলাকার নাগরী লিপিতে লিখিত, যাহার সঙ্গে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ব্যবহৃত আধুনিক দেবনাগরী লিপির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

বাংলা—বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রমবিকশিত রূপ সহ আধুনিক বাংলা লিপির পরিণত রূপটি দেখান হইয়াছে একটি তালিকা, আলোকচিত্র এবং দেওপাড়ার মূল শিলালেখটি সহযোগে।

উত্তর ভারতে অশোকের শিলালিপিই প্রাচীনতম লিপি, যাহার পরবর্তী রূপ দেখা যায় শুঙ্গ ও কুষাণ শিলালেখে। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভলেখটিতে ব্যবহৃত লিপি সমগ্র উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মৌখরী লেখগুলিতে উত্তর প্রদেশ এবং পূর্বভারতের তৎকালীন লিপিরূপ দেখা যায় এবং শশাংকের তাম্রদানপত্রে পূর্ব ভারতে পূর্ব-পাল যুগের লিপির পরিচয় পাওয়া যায়। পাল রাজাদের আমলে এই লিপির প্রাথমিক ক্রমবিকাশ দেখা যায় ধর্মপালের একটি তাম্রদানপত্রে এবং পরবর্তী বিকাশ দেখা যায় খ্রীষ্টীয় দশম শতকের লিপিতে। বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখে বাংলা অক্ষরমালার আদি রূপ দেখা যায়, এবং আরও ক্রমবিকশিত রূপ দেখা যায় লক্ষ্মণ সেনের সময়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে রক্ষিত চণ্ডীদাস রচিত

ষোড়শ শতকের কৃষ্ণ কীর্তন পুঁথিতে ইহার শেষ পর্যায়ের পূর্ণ বিকশিত রূপ দেখা যায়, যাহা প্রায় আধুনিক বাংলা লিপির সমতুল্য।

গ্রন্থ তামিল—গ্রন্থ-তামিল লিপি এবং দক্ষিণ ভারতের তামিল অঞ্চলে এই লিপির ক্রমবিকাশ একটি তালিকার সাহায্যে দেখান হইয়াছে। অশোকের ব্রহ্মগিরি শিলালিপি ব্রাহ্মীর দক্ষিণ ভারতীয় লিপিরূপ এবং খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে এইটিই সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সাধারণ লিপি ছিল। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি স্থানীয় বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত অক্ষর 'ল', 'ল়', 'র়', এবং 'ন'র একটি বিশেষরূপ দেখা যায় তিরুচিরা-পল্লী, মাদুরাই এবং তিরুনেলভেলী প্রভৃতি তামিল অঞ্চলের অতি প্রাচীন গুহালেখগুলিতে। প্রাচীনতম পল্লবলেখগুলিতে ব্রাহ্মীলিপির একটি বিচিত্র রূপ দেখা যায় এবং গ্রন্থ-লিপিতে ইহার ক্রমপরিণতি ঘটে, যাহাতে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যাংশ প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অনুপূরক অক্ষরের উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। ইহার আর একটি পরিণতি ঘটে তামিল লিপিতে, পূর্বোক্ত অতিরিক্ত অক্ষরগুলি সহ যাহার অক্ষরমালা ভাষা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পল্লবরাজ পরমেশ্বর বর্মণের কূরাম দানপত্রে এই দুইটি লিপিই দেখা যায়। পরবর্তী শতক-গুলিতে গ্রন্থ ও তামিল-লিপির ক্রমবিকাশ দেখা যায় আদি-পাণ্ড্য ও চোল, পরবর্তী পাণ্ড্য ও চোল এবং বিজয়নগরের লেখগুলিতে। বিজয়-নগর যুগের পরে লিপিগুলির ক্রমবিকাশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, আধুনিক লিপির সঙ্গে বিজয়নগরের লেখগুলির তুলনামূলক বিচারে তাহা বুঝা যায়।

কানাড়ী তেলেগু—বারান্দার শেষ অংশে অনুরূপভাবে কানাড়ী এবং তেলেগু লিপির ক্রমবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। অশোকের ব্রহ্মগিরি এবং এরাগুডি শিলানুশাসনের দক্ষিণী লিপি-রূপ হইতে যে লিপির

বিকাশ হইয়াছিল কানাড়ী এবং তেলেগু অঞ্চলের লিপিগুলি তাহা হইতে উদ্ভূত হয়। সাতবাহন সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং পূর্ব সমুদ্রপ্রান্ত পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র একটি সাধারণ লিপি প্রচলিত ছিল। কানাড়ী অঞ্চলে কদম্বেরা একটি লিপি ব্যবহার করিতেন, যাহা বাকাটকদের ত্রিভুজশীর্ষক লিপির অনুরূপ, কিন্তু অধিকতর অলঙ্কৃত। আদি পশ্চিমী চালুক্য, রাষ্ট্রকূট এবং উত্তরকালীন পশ্চিমী চালুক্য লিপিগুলিতে কানাড়ী অঞ্চলে যে বিবর্তন ধারার সূচনা হয়, তাহা উত্তরকালে অলঙ্কারমণ্ডিত হোয়সল লিপিতে পরিণতি লাভ করে, যাহা হইতে আধুনিক কানাড়ী লিপির বিবর্তন সহজেই অনুধাবন করা যায়।

তেলেগু অঞ্চলে বিষ্ণুকুণ্ডী লিপি হইতে উদ্ভূত হয় পূর্বী চালুক্যীয় লিপি, যাহার ক্রমবিকাশ ঘটে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীব্যাপী। তেলেগু লিপির পরবর্তী অধ্যায়ের বিকাশ দেখা যায় কাকতীয়দের রাজত্বকালে, তাহারও পরে রেড্ডীদের সময়ে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে বিজয়নগব যুগে, যাহা হইতে তেলেগু লিপির উদ্ভব সহজেই অনুসরণ করা যায়।

মুসলিম যুগীয় কক্ষ

এই বিভাগের একতলার পূর্বপ্রান্তীয় কক্ষটিতে মুসলিমযুগীয় নিদর্শন-সংগ্রহ* প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং পূর্বোক্ত পুরাবস্তু-সংগ্রহের তুলনায় ইহার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। ইহার ভাস্কর্য-সংগ্রহটিতে দুইটি প্রধান বিভাগ দেখা যাইবে, একটি উত্তর ভারতে প্রাপ্ত নিদর্শনদ্বারা গঠিত, অপরটি বাংলাদেশের মালদহ জেলার গৌড়ে প্রাপ্ত এবং অধিকতর উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম দিকের দেওয়াল-সংলগ্ন এবং উচ্চবেদিতে স্থাপিত দ্বারদেশের অংশগুলি বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ডোরীয় কারুকার্য এবং রুহিতনাকৃতি অলঙ্করণ-মণ্ডিত। একই স্থানে প্রাপ্ত আর একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক। একটি ঢেউকাটা খিলানের দুই পাশে দুইটি প্রস্ফুটিত গোলাপের অলঙ্করণসহ, মধ্যে সোমলতা ও পদ্মের নিখুঁত অলঙ্করণ-মণ্ডিত এই নিদর্শনটি কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদিকার উপর প্রদর্শিত আছে। এই কারুকার্যমণ্ডিত কষ্টিপাথরের খণ্ডটি একটি মসজিদের প্রাচীরগাত্রে প্রোথিত ছিল। ইহার অপরদিকে একটি অসম্পূর্ণ মহিষ-মর্দিনীমূর্তি আছে, যাহার গাত্রে ছেদনীর চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কক্ষের দক্ষিণভাগে আরও কতকগুলি সোমলতা ও পদ্মের অলঙ্করণ-মণ্ডিত গৌড়ের স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ আছে, যাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই স্থানে এই অলঙ্কারধারাটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ইহা ছাড়া পদ্মফুলের ভিন্নতর অলঙ্করণ এবং পত্রপুষ্পের অন্যতর সজ্জামণ্ডিত আরও

*মুসলিমযুগীয় নিদর্শন-সংগ্রহ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটির জন্য আমি শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য, এম-এ, পি, আর, এস, সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

কয়েকটি নিদর্শন এখানে আছে। কক্ষের উত্তর এবং পূর্বদিকের প্রায়-সম্পূর্ণ অংশব্যাপী বিভিন্ন কালের ও বিবিধ শ্রেণীর শিলালেখ প্রদর্শিত আছে। ইহার মধ্যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক আফ্রিকার লোহিত সাগরের উপকূলে প্রাপ্ত ৪৩৭ হিজিরার (১০৪৫ খ্রীঃ) কুফী রীতিতে লিখিত একটি সমাধি-ফলক। এখানে প্রদর্শিত শিলালেখের অধিকাংশই ৬০৬ হিজিরা (১২১০ খ্রীঃ) এবং ১১৬৩ হিজিরার (১৭৪৯-৫০ খ্রীঃ) মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালের উৎসর্গমূলক লেখ। সবশেষ শিলালেখটি মুঘল সম্রাট আহ্‌মদ্‌ শাহের আমলের। এগুলির মধ্যে কয়েকটি অতি জটিল তুগ্‌রা রীতিতে লিখিত, এবং কয়েকটি নস্‌খ্‌া এবং নাস্‌তালিক রীতিতে লিখিত। পারস্যের নিদর্শন সংগ্রহের মধ্যে কোশ উপত্যকার কয়েকটি সমাধি-স্তম্ভ এবং শোকগাথার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। লেখগুলিব মধ্যে বাংলা দেশের মালদহে প্রাপ্ত বৃহত্তম কষ্টিশিলাটি সুলতান ইউসুফ শাহের আমলের এবং ইহাতে ৮৮৪ হিজিরায় (১৪৭৯ খ্রীঃ) একটি মসজিদ নির্মাণের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। হিজিরা দশম শতাব্দীর ছু'টি উল্লেখযোগ্য দ্বিভাষিক শিলালিপিও এখানে আছে, যাহার একটি বাংলাদেশের কালনায় প্রাপ্ত এবং যাহাতে মিশ্র আরবী ও ফারসী ভাষায় ফিরোজশাহের রাজত্বকালে একটি মসজিদ নির্মাণের ঘটনা উল্লিখিত আছে; অপরটি বিহারের ভাবুয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত, ইহাতে শের শাহের আমলে একটি পুষ্করিণী খননের ঘটনা ফারসী ও সংস্কৃত এই ছুইটি ভাষায় পৃথকভাবে লিখিত আছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে আছে কোরাণের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রতিলিপি, যাহার ধাতুময় আধারটিতে একটি আতস কাঁচ এবং গলায় ধারণের জন্য একটি বেষ্টনী যুক্ত আছে। মুঘলসম্রাট আকবরের সীলমোহরাঙ্কিত লায়লা-মজনুর চিত্রিত পুঁথিটি উপহার প্রাপ্ত একটি

মূল্যবান সংগ্রহ। কক্ষের মধ্যস্থলে প্রদর্শাধারে রক্ষিত কারুকার্যময় হসন্-ই-হাসীন পুঁথিটি এখানকার পুঁথি সংগ্রহের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। ফারসী টীকাসহ কোরাণের প্রতিলিপিটিও উল্লেখযোগ্য।

পুঁথিসংগ্রহের পাশের প্রদর্শাধারে সামারা ও মেসোপটেমিয়ার পোড়ামাটীর পাত্রের ভগ্নাবশেষ এবং কোয়াইন ও পূর্ব-পারস্যের বাসনপত্র দেখান হইয়াছে। পারস্যের রাগেম নামক স্থানে প্রাপ্ত মীনাকরা পাত্র ও টালির টুক্‌রা এবং সুলতানাবাদে প্রাপ্ত অনুরূপ মীনাকরা পেয়ালা ও টালির একটি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহও এখানে আছে। এইগুলি, এবং বালুচি-স্থানের মাকরানে ও সীস্তানে প্রাপ্ত মীনাকরা পোড়ামাটীর পাত্র ভারত সীমান্ত-পরপারের মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিতেছে।

সমুদ্র হইতে সূর্য ও চন্দ্রের উচ্চতা পরিমাপনের পিত্তল নির্মিত দুইটি যন্ত্র (আস্তারলার) বারাণসী (১০৪৮ হিজিরা তারিখ সম্বলিত) এবং সীতাহাটী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এবং এই দুই স্থানেই শুধু নয়, সুদূর পারস্যের হিরাটে প্রাপ্ত অনুরূপ যন্ত্র প্রমাণ করে কিভাবে প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে সাংস্কৃতিক ভাবধারাব আদান প্রদান ও নৌ-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে পারস্যের সিরাজ নামক স্থানে প্রাপ্ত দিকনির্ণয় যন্ত্রটি (গোফ্‌ত) উল্লেখ করা প্রয়োজন। পালিশকরা জেড্‌-প্রস্তরের হাতলযুক্ত মুঘল যুগের একটি ছুরিকা, সোনার গিলটি করা কোষসহ একটি তরবারি এবং অলঙ্কারময় ধাতুনির্মিত কোষসহ একটি তিব্বতী তরবারিও এখানে প্রদর্শিত আছে।

এই বিবরণীটি সমাপ্ত করার পূর্বে হায়দরাবাদে (সিন্ধু প্রদেশ) প্রাপ্ত বিবিধ পুষ্প ও জ্যামিতিক অলঙ্কারমণ্ডিত মীনাকরা টালিগুলি এবং বঙ্গদেশের গৌড়-মালদহে প্রাপ্ত বিবিধ অলংকার খোদিত পোড়ামাটীর ইষ্টকগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। এই ইষ্টকগুলিতে যে অলঙ্করণ

আছে, তাহা কদাচিৎ অন্যত্র দেখা যায়। বাগদাদে প্রাপ্ত শিকারদৃশ্য অঙ্কিত মীনাকরা একটি কলস পারস্যের শ্রমশিল্পের একটি সুন্দর নমুনা। [৮নং চিত্র, 'খ'।]

রাজকুমার দারাশিকোহের একটি নিশানসহ ৬৫টি ফরমান ও সনদের একটি সংগ্রহ এই বিভাগে আছে ; কিন্তু মাত্র কয়েকটি ছাড়া অবশিষ্ট-গুলি মুদ্রাকক্ষে সঞ্চিত আছে। রাজকীয় মোহরাঙ্কিত ফরমানের মধ্যে দ্বিতীয় আলমগীরের ফরমানটি উল্লেখযোগ্য এবং এখানে তাহার একটি ছবি দেওয়া হইয়াছে। [৮নং চিত্র, 'ক']

কক্ষ হইতে বাহিরে যাওয়ার সময় ঢোলপুর রাজ্য হইতে পাওয়া পারস্যের তিনটি টালি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এইগুলি পত্রপুষ্প, মানুষ এবং অন্য প্রাণীমূর্তি দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। ইহারই পার্শ্বে লাহোর অথবা মুলতানে প্রাপ্ত মীনাকরা টালির [৮নং চিত্র, 'গ'] উপর বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের একটি রুবাই লিখিত আছে।

প্রাগৈতিহাসিক এবং বিবিধ পুরাবস্তু বিভাগ

গান্ধার কক্ষের দক্ষিণে যে কক্ষটি, তাহার অর্দ্ধাংশে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলি সজ্জিত আছে এবং অপরার্দ্ধে ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত আদি-ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন এবং অন্যান্য দেশের পুরাবস্তু প্রদর্শিত আছে।

প্রাগৈতিহাসিক বিভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত পুরোপলীয়, ক্ষুদ্রোপলীয় এবং নবোপলীয় যুগের হাতিয়ারের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় সংগ্রহ এখানে আছে। ভারতীয় পুরোপলীয় হাতিয়ারগুলি অধিকাংশই কোয়ার্টজাইট পাথরের শল্কের ছেদন, খনন ও আঘাত করার অস্ত্র এবং এইগুলি আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্য-আমেরিকার হাতিয়ারগুলির অনুরূপ। ভারতীয় পুরোপলীয় হাতিয়ারের বৃহত্তম অংশের ইউরোপের আবিভেলীয় ও অ্যাশুলীয় যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। ভারতে পাথরের হাতিয়ার প্রথম আবিষ্কার করেন আর. ব্রুস-ফুট, এক শতাব্দী পূর্বে মাদ্রাজের নিকটে পল্লবরমে। দক্ষিণ ভারত পুরোপলীয় হাতিয়ারে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সমস্ত হাতিয়ার বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, নর্মদা ও সবরমতীর নদীতীরে, দক্ষিণ-পশ্চিম ঝান্সীর এবং পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর তীর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানেও পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. ডি. টেরার নেতৃত্বে ইয়েল-কেম্ব্রিজ অভিযাত্রীদল হিমালয়ের হিমবাহ এবং ভূতাত্ত্বিক ভিত্তিতে ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে গবেষণা করেন। ডি. টেরার সোয়ান-

উপত্যকা-সংস্কৃতি এবং নর্মদা-উপত্যকা-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল অনুসরণ করিয়া ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি অভিযাত্রী দল পাঠান ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা ও গুজরাট গবেষণা সমিতি। অধুনা-লুপ্ত প্রাণীর কঙ্কালের সঙ্গে জড়িত অবস্থায় পুরোপলীয় যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নর্মদা-উপত্যকার উপলস্তরে পাওয়া একটি হাতিয়ার যাহা হ্যাকেট পাইয়াছিলেন নরসিংহপুর জেলার ভূত্রায়, এবং একটি তৈরী শঙ্কের হাতিয়ার, যাহা পাইয়াছিলেন ওয়াইনে হায়দরাবাদে পৈঠানের নিকটে মুঙ্গীস্থ গোদাবরী উপত্যকার উপলস্তরে, যেখানে অনেক অস্থিও পাওয়া গিয়াছে। এই উপলস্তরগুলি, যেখানে এইসব হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছিল বহু প্রাচীনকালে, পৃথিবীর প্রাথমিক স্তর-সংহতির যুগে।

ভারতবর্ষে পুরোপলীয় যুগের শেষ ও নবোপলীয় যুগের আরম্ভের মাঝে একটি বিরাট অবকাশ বর্তমান। নবোপলীয় যুগের অধিবাসীদের বসবাসের নিদর্শন পুরোপলীয় যুগ অপেক্ষা আরও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ছড়াইয়া আছে। এই বিস্তৃতি হাতিয়ার নির্মাণের উপযুক্ত পাথরের সুলভতার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগে ট্রাপ-প্রস্তরের প্রাচুর্য এবং কাবেরী নদীর দক্ষিণ ভাগে তাহার বিরলতা, যথাক্রমে এই দুই অঞ্চলে নবোপলীয় কুঠারের প্রাচুর্য ও বিরলতার কারণ। নবোপলীয় হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ ভারতের সালেম, অনন্তপুর, কুরনুল ও বেলারী জেলায় এবং হায়দরাবাদে, দক্ষিণ গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে, বুন্দেলখণ্ডে, উত্তর প্রদেশের অঞ্চলবিশেষে, মধ্যপ্রদেশের উত্তরের জেলাগুলিতে, গুজরাটে, বোম্বাইয়ের দক্ষিণভাগে, এবং কদাচিৎ পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, সিন্ধুদেশে ও বাংলাদেশে। নবোপলীয় কুঠারগুলি সর্বদাই ট্রাপ প্রস্তরে নির্মিত; কিন্তু অন্যান্য হাতিয়ারের মধ্যে শঙ্ক, হাতুড়ি ও যাঁতা-পাথরগুলি গ্রানাইট, নাইস,

হেমাটাইট্ ও কোয়ার্টজাইট প্রস্তরে নির্মিত। উত্তরপ্রদেশ, রেওয়া, বাঘেলখণ্ড, গুজরাট এবং অন্যান্য স্থানে বিন্ধ্যের পার্বত্য অঞ্চলে প্রাপ্ত নবোপলীয় যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতিয়ারগুলি সুন্দর সুন্দর রঙের চার্ট, অ্যাগেট, জ্যাস্পার এবং কারনেলিয়ান পাথর দ্বারা নির্মিত। এইগুলিকে ক্ষুদ্রোপলীয় হাতিয়ার বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পুরোপলীয় এবং নবোপলীয় যুগের হাতিয়ার মধ্যস্থলের প্রদর্শাধারগুলিতে রাখা হইয়াছে। বহির্ভারতের, বিশেষতঃ ফ্রান্সের অনুরূপ কিছু নিদর্শন তুলনামূলক আলোচনার জন্য এখানে রাখা হইয়াছে। ভারতে নবোপলীয় যুগের পরবর্তী যুগটি তাম্রযুগ নামে অভিহিত। এই যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য নিদর্শন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কুররাম এবং পূর্বভারতে মেদিনীপুব পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে কানপুর জেলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার গুঙ্গেরিয়ায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাটির তলায় পাওয়া তামার অস্ত্রশস্ত্রের একটি বিরাট সংগ্রহ। ইহার মধ্যে কয়েকটি রূপার পাত এবং কতকগুলি তামার অস্ত্র-শস্ত্র আছে যেগুলি হাতুড়িদ্বারা বিশুদ্ধ ধাতুর উপর আঘাতের দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সংগ্রহটির মধ্যে বাইশটি চ্যাপ্টা তামার কুঠার ও অন্যান্য হাতিয়ার, বৃষমস্তকাকৃতি আটটি রূপার পাত এবং চারিটি চক্রাকার পাত প্রাচীর সংলগ্ন প্রদর্শাধারে রক্ষিত আছে। এইগুলির সঙ্গে প্রদর্শিত অন্যান্য তামার বস্তুর মধ্যে উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদের নিকটে ফতেগড়ে প্রাপ্ত চারিটি তরবারি ও ছুরিকা এবং একটি অপরিণত মনুষ্যমূর্তি উল্লেখ্য।

রাখালদাস ব্যানার্জী কর্তৃক সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় মহেন্-জোদাড়োর আবিষ্কার এবং ঐ স্থানসহ সিন্ধু-উপত্যকার অন্যান্য স্থানে এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার হরপ্পায় খননকার্যের ফলে ভারতীয়

সংস্কৃতির ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। তাম্রপলীয় যুগ নামে অভিহিত এই যুগে তাম্র এবং প্রস্তর উভয়বিধ হাতিয়ারই ব্যবহৃত হইত। মহেনজোদাড়ো এবং হরপ্পার নিদর্শনগুলি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার সর্বাধ্যক্ষের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত। সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যের ফলে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকের একটি উন্নত নগর-সভ্যতা উদ্‌ঘাটিত হয়। নগরের বিন্যাস, প্রশস্ত রাজপথ, গৃহগুলির নক্‌শা, চমৎকার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এবং বিরাট স্নানাগারটি সেই সুপ্রাচীনকালে অতি উচ্চ মানের সভ্যতার পরিচায়ক। সূক্ষ্মমানের ওজন এবং চিত্রলিপি সম্বলিত সীলমোহরগুলি, যাহার রহস্য এখনও উন্মোচন করা সম্ভব হয় নাই, প্রগত প্রতিভার লক্ষণ। পোড়ামাটীর মূর্তি, বিশেষতঃ বলিষ্ঠ বৃষমূর্তিটি অতি সুন্দর ও সুগঠিত [৯নং চিত্র, 'ক'-'ঙ'-'জ']। এযুগের ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শনও এখানে আছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং ত্রিপত্র অঙ্কিত উত্তরীয় পরিহিত একটি মনুষ্যমূর্তি উল্লেখযোগ্য। সুকুমার ভঙ্গিতে নৃত্যরত একটি তন্বী-নর্তকীর ব্রোঞ্জমূর্তি সে যুগের ধাতুশিল্পীর কলাকুশলতার পরিচায়ক। সীলমোহরগুলি [৯নং চিত্র, 'খ'-'গ'-'ঘ'] বিভিন্ন মূর্তি ও চিত্রলিপিসম্বলিত এবং এইগুলির দ্বারা সেই সুদূর অতীতের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সীলমোহরে দেখা যায়, শৃঙ্গযুক্ত শিরোভূষণধারী, ঊর্দ্ধলিঙ্গ একটি যোগী মূর্তি—চারিদিকে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ও মহিষসহ তিনি উপবিষ্ট আছেন। এই মূর্তিটিকে যোগীরূপে শিব এবং পশুপতিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য নানারূপ মূর্তিও এই সীলমোহরে পাওয়া যায়—যথা, বৃক্ষসহ একশৃঙ্গী, নিম্নাভিমুখশৃঙ্গ বৃষ, ব্যাঘ্র অথবা কাল্পনিক প্রাণীর সহিত যুদ্ধরত মানুষ ইত্যাদি। কতকগুলি সীলমোহরের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত অনুরূপ সীলমোহরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য সুমেরীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইহার যোগসূত্র নির্দেশ করে। মেসোপটেমিয়ার উর এবং কিশে আবিষ্কৃত বস্তুগুলি সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলির

সঙ্গে এতো সাদৃশ্য বর্তমান যে, ইহাদের একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই দুইটি সংস্কৃতিকে একটি সাধারণ সংস্কৃতির মূলোদ্ভূত বলিয়া মনে করাই বোধ হয় নিরাপদ। সীলমোহরগুলি, তামার হাতিয়ার, চিত্রিত মৃৎপাত্র, মাতৃকামূর্তিসহ পোড়ামাটির মূর্তিগুলি, শঙ্খের জিনিসগুলি, ফ্লিন্টের হাতিয়ার, পুঁতির মালা, এবং অন্যান্য নিদর্শন দেওয়াল সংলগ্ন প্রদর্শাধার এবং মধ্যস্থলের প্রদর্শাধার-গুলিতে রক্ষিত আছে। অনুরূপভাবে, হরপ্পা এবং মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত পোড়ামাটির পাত্রসহ অন্যান্য নিদর্শন দেওয়াল সংলগ্ন একটি প্রদর্শাধারে সজ্জিত আছে। বালুচিস্থানের কালাত রাজ্যের নাল নামক স্থানে প্রাপ্ত যে পোড়ামাটির চিত্রিত পাত্রগুলি [৯নং চিত্র, 'ঞ'] ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অধুনালুপ্ত কোয়েটা সংগ্রহশালা হইতে ভারতীয় সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয়, সেগুলি দুইটি প্রদর্শাধারে দেখান হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে যেগুলি ঐতিহাসিক কবর খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশের উপর দুইটির অধিক রং দ্বারা জ্যামিতিক নক্শা অঙ্কিত আছে। যদিও এই কুম্ভকলাও তাম্রপলীয় যুগের, তথাপি মহেন্জো-দাড়োর লালের উপর কালো চিত্র করা পোড়ামাটির পাত্র হইতে এই-গুলি সম্পূর্ণ পৃথক। সম্ভবতঃ এই দুই প্রকারের কুম্ভকলা বিভিন্নকালের দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিতেছে।

দক্ষিণ ভারতের লৌহ যুগের নিদর্শনের মধ্যে আছে পোড়ামাটির পাত্র ও বিবিধ হাতিয়ার। এইগুলি প্রধানতঃ পাওয়া গিয়াছে কুর্গের প্রাগৈতিহাসিক ঢিবিগুলি হইতে ; এবং ইহা ছাড়া মাদ্রাজের সালেম, বেলারী, চিঙ্গলেপুট এবং তিরুনেলভেলী জেলাগুলি হইতে। চিঙ্গলেপুট জেলার পেরুম্বেয়ার এবং তিরুনেলভেলী জেলার আদিচানাল্লুর হইতে বিবিধ কৌতূহলজনক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ, এবং নীলগিরি অঞ্চলের পোড়ামাটির পাত্র মাদ্রাজ

সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এখানকার সংগ্রহটি ছোট, কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয়।

এই কক্ষের দক্ষিণার্ধে ঐতিহাসিক যুগের যে বিবিধ নিদর্শনগুলি প্রদর্শিত তাহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি বিরাট পাথরের সিন্দুক, যাহা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পেপ্ সাহেব উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপরাহওয়া নামক স্থানে একটি স্তূপ খনন করিয়া পান। ইহার মধ্যে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি সিন্দুকের কাছে একটি প্রদর্শাধারে রক্ষিত আছে। এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে আছে একটি স্ফটিকের পাত্র, পাথরের পাত্র, এবং সোনার ফুল প্রভৃতি বিবিধ বস্তু। একটি পাথরের ধাতুপাত্রে প্রাচীন, সম্ভবতঃ ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে এইরূপ একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে ঃ 'শাক্যদিগের প্রভু বুদ্ধের এই ধাতু-পাত্রটি সুকৃতির ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র এবং স্ত্রী কর্তৃক রক্ষিত।' পাথরের পাত্রটিতে প্রাপ্ত অঙ্গারীকৃত অস্থির পুরাতাত্ত্বিক মূল্য অপেক্ষা ধর্মীয় মূল্য অধিক বিবেচিত হওয়ায় ভারত সরকার এটিকে সিয়ামের রাজাকে উপহার দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে সার জন মার্শালের তক্ষশীলা ও ভীটায় খননের ফলে প্রাপ্ত বস্তু [৯নং চিত্র, 'ঠ'] এবং বোধগয়া হইতে কানিংহাম কর্তৃক সংগৃহীত বস্তুগুলি মধ্যাস্থলের প্রদর্শাধারগুলিতে রক্ষিত আছে। এলাহাবাদ জেলার কোশামে [৯ নং চিত্র, 'চ'], চম্পারন জেলার নন্দনগড়ে [৯ নং চিত্র, 'ছ'] এবং গোরখপুর জেলার কাসিয়ায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি প্রাচীর সংলগ্ন প্রদর্শাধারগুলিতে সজ্জিত আছে।

পোড়ামাটির ফলকগুলি, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের মত স্থানে যেখানে পাথরের অপ্রতুলতা আছে, সেখানকার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করে। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর, বগুড়া

জেলার মহাস্থান এবং কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে প্রাপ্ত ফলকগুলির কয়েকটি নির্বাচিত নিদর্শন এখানে দেখান হইয়াছে। লক্ষ্যের বিষয় যে, পোড়ামাটির শিল্পকলা ক্রম-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ লাভ করিয়াছে পাহাড়-পর্বত শূন্য সমতল ভূমিতে, যেখানে নদীবাহিত নরম পলিমাটির প্রাচুর্য বর্তমান। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মন্দির কিম্বা অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভের প্রাচীরসজ্জায় পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বিষ্ণুপুরের মন্দিরটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন শেষশায়ী বিষ্ণুর মূর্তি সম্বলিত ভীটারগাঁওএ প্রাপ্ত গুপ্তযুগের একটি ফলক। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের—যাহার ঐতিহ্য আজও সজীব—প্রাথমিক অধ্যায় সম্পর্কে গবেষণার জন্য পাহাড়পুর ও মহাস্থানের ফলকগুলি প্রয়োজনীয়।

মধ্যস্থলের দুইটি প্রদর্শাধারে দক্ষিণ ভারতীয় একটি ব্রোঞ্জমূর্তিসংগ্রহ রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে শেষ পর্যায়ের পল্লব শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ একটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি আছে। সোমাস্কন্দের মূর্তিগুলি [৬নং চিত্র, 'ক'] আদি-চোলযুগের অতি সুন্দর নিদর্শন। চোলযুগের শৈব শূল এবং প্রদোষমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। নটেশমূর্তিগুলির মধ্যে একটিতে নৃত্যরত শিবের দুইপাশে দুইটি গণমূর্তি তাল রক্ষা করিতেছেন। পার্বতীর লালিত্য-পূর্ণ মূর্তিটি এই জাতীয় মূর্তির একটি সুন্দর নিদর্শন। এই সংগ্রহটির মধ্যে নাগপট্টিনমের কতকগুলি বুদ্ধমূর্তি আছে, যাহার কয়েকটিতে লেখ উৎকীর্ণ। মাদ্রাজ প্রদর্শশালায় ও অন্যত্র রক্ষিত অনুরূপ মূর্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ নাগপট্টিমে বহু বৎসরব্যাপী যে বৌদ্ধ উপনিবেশ এবং বৌদ্ধ বিহার গড়িয়া উঠিয়াছিল ইতিহাসের সেই অধ্যায়টির উপর এই মূর্তিগুলি আলোকসম্পাত করে।

দেওয়াল সংলগ্ন একটি প্রদর্শাধারে তিব্বত ও নেপালে প্রাপ্ত মধ্য-যুগীয় ও তাহার পরবর্তীকালের কয়েকটি মূর্তি রক্ষিত আছে। অন্যান্য

প্রদর্শাধারগুলিতে ব্রহ্মদেশ ও মধ্য-এশিয়ার কিছু নিদর্শন আছে [৯ নং চিত্র, 'ট']। মধ্যস্থলের প্রদর্শাধারগুলিতে আছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি, পুঁতি, সীলমোহর এবং ফলকগুলি। সীলমোহরের সংগ্রহটি বিশেষ সমৃদ্ধ। সকল প্রকার সীলমোহরই এখানে আছে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলির পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ষোড়শ শতকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত লেখগুলি প্রদর্শিত আছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই শিলালেখ। কতকগুলি তাম্রফলকও আছে, যেগুলি দুই, তিন বা ততোধিক তাম্রফলকে লিখিত ও সীলমোহরযুক্ত এক একটি বলয়ে গ্রথিত। এই সীলমোহরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; কারণ দাতার রাজকীয় সীলমোহর থাকার জন্য দানপত্রটি পাকা দলিল রূপে গণ্য হইয়াছে।

এই কক্ষে প্রদর্শিত বিবিধ বিদেশী পুরাবস্তুগুলি মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন ও গ্রীস হইতে সংগৃহীত। মিশরীয় পুরাবস্তুর মধ্যে আছে ওসিরিস পুত্র হোরোসকে ক্রোড়ে লইয়া ঈসিস, বেস প্রভৃতি প্রাচীন দেবদেবীর ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি। ওসিরিসকে একটি মমীকৃত রাজা এবং পাতাল অধিপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার ভগ্নী এবং পত্নী, পুত্র-ক্রোড়ে ঈসিসের মূর্তিটি পরবর্তীকালে শিশুসহ ম্যাডোনামূর্তির আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহাছাড়া চিত্রলিপিযুক্ত মমীর বস্ত্র, গলার অলঙ্কার, সমাধিমূর্তি, লেখযুক্ত পবিত্র গুবরটিকা (গোবর-পোকা), বানরমুখো হাপি, মানুষমুখো আমসেট, শেয়ালমুখো টুঅট্‌মুট্‌ফ এবং শ্যেনমুখো কাভসেনুফ প্রভৃতি পাতালপুরীর অপদেবতার মুণ্ডখচিত ঢাকনিসহ অ্যালাবাস্টারের পাত্রও এখানে আছে। এই কক্ষের মধ্যস্থলে রক্ষিত বস্ত্রজড়িত মিশরীয় মমীটি একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। মমীটির কাঠের আচ্ছাদনটি সরাইয়া তার পাশে রাখা হইয়াছে। একটি শ্মশ্রূমণ্ডিত যোদ্ধা এবং

একটি নিগ্রো বালক উৎকীর্ণ চূর্ণাপাথরের খণ্ডটি পার্সিপোলিস হইতে সংগৃহীত। ব্যাবিলনের পুরাবস্তুর মধ্যে আছে কীলকাকৃতি লেখ-উৎকীর্ণ কয়েকটি ইষ্টক। গ্রীসের এথেন্সে প্রাপ্ত কয়েকটি মাটির পাত্র ও প্রদীপও এখানে আছে।

এই সংগ্রহশালায় ভারতীয় মুদ্রার একটি বিরাট সংগ্রহ রক্ষিত আছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজবংশের মুদ্রায় সমৃদ্ধ ইহা একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সংগ্রহ। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বযুগের অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা, ঢালাই মুদ্রা এবং ছাঁচে আহত মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলিম যুগের বিভিন্ন মুদ্রা এখানে আছে। এইসব মুদ্রার মধ্যে ইন্দো-গ্রীক, ইন্দো-পার্থিয়ান, কুষাণ, মথুরার ক্ষাত্রপ, পাঞ্চালের রাজা, ক্ষাত্রপ, সাতবাহন, যৌধেয়, ঔতুম্বর, মালব ইত্যাদি, এবং গুপ্ত ও উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় সমস্ত প্রকার মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের মধ্যযুগীয় এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মুদ্রাও এই সংগ্রহে আছে। ভারতে প্রথম প্রচলিত মুসলিম যুগের মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর শেষ মুঘলসম্রাটের মুদ্রার সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। পিয়ার্স সাহেব কর্তৃক ভারতে সংগৃহীত গ্রীক, রোমীয়, ইরাণীয় এবং ভারতীয় খোদিত রত্নগুলি, এবং আসিরীয় সীলমোহর ও সাসাণীয় খোদিত রত্নগুলি এখানকার মূল্যবান সংগ্রহটিকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে। এই রত্নগুলি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-সমীক্ষার সর্বাধ্যক্ষের কাছ হইতে ঋণপ্রাপ্ত। ইহা ছাড়া, মুঘলসম্রাট শাহজাহানের একটি মরকতের ধনুক-অঙ্গুরীয়, একটি পেয়ালা, যাহা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ লুণ্ঠন করেন, তাহাও এখানে রাখা আছে। এই মুঘল রত্নগুলি ভারত সরকারের ঋণদত্ত। মুদ্রা কক্ষের পুরাবস্তুগুলি প্রদর্শিত করা হয় নাই। মুদ্রাকক্ষে প্রবেশাধিকার কতকগুলি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার্থী এবং দর্শকগণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ঐগুলি দেখিতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী

অ্যালান, জে.

১। ক্যাটালগ্ অফ্ ইণ্ডিয়ান কয়েন্স্ ইন্ দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ক্যাটালগ্ অফ্ কয়েন্স্ অফ্ দি গুপ্ত ডাইন্যাস্টীজ্ অ্যাণ্ড অফ্ শশাঙ্ক, কিং অফ্ গৌড় (লণ্ডন, ১৯১৪), পৃঃ ১-১৩৮ এবং ১-১৮৪, চিত্র ১-২৪।

২। ক্যাটালগ্ অফ্ ইণ্ডিয়ান কয়েন্স্ ইন্ দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ক্যাটালগ্ অফ্ কয়েন্স্ অফ্ এন্শেন্ট্ ইণ্ডিয়া (লণ্ডন ১৯৩৬), পৃঃ ১-১৬৭ এবং ১-৩১৮।

অ্যাণ্ডারসন্, জে.

ক্যাটালগ্ অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডবুক অফ্ দি আরকিওলজিকাল কালেক্শন্ ইন্ দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, দুইখণ্ড (কলিকাতা, ১৮৮৩), পৃঃ ১-২৯৫ এবং ১-৫২১।

অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ্ দি আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, ১৯০১-১৯৩৮।

ব্যাকোফার, এল. — আর্লি ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌পচার (প্যারিস, ১৯২৯), দুইখণ্ড, পৃঃ ১-১৩৭, চিত্র ১-৬২ এবং ৬৩-১৬১ ।

ব্যানার্জী, জে. এন. — দি ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফ্ হিন্দু আইকনোগ্রাফী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১), পৃঃ ১-৪৫৯, চিত্র ১-১০ ।

ব্যানার্জী, আর. ডি. — ১। দি টেম্পল অফ্ শিব অ্যাট্ ভূমারা, মেময়ার্স অফ্ দি আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, ১৬ নং (কলিকাতা, ১৯২৪), পৃঃ ১-১৪, চিত্র ১-১৭ ।

২। আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া—ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ মিডিয়েভাল স্কাল্‌পচার (দিল্লী, ১৯৩৩), পৃঃ ১-২০৩, চিত্র ১-৯৬ ।

৩। হিস্‌ট্রী অফ্ ওড়িষ্যা, দুই খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৩০ ও ১৯৩১), পৃঃ ১-৫৫১, চিত্র ১-৪৬ এবং পৃঃ ১-৪৮১, চিত্র ১-৯৫ ।

৪। এজ্ অফ্ দি ইম্‌পিরিয়াল গুপ্তজ, মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী লেকচার ১৯২৪ (বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩), পৃঃ ১-২৫০, চিত্র ১-৩৯ ।

৫। দি অরিজিন্ অফ্ দি বেঙ্গলী স্ক্রীপট (কলিকাতা, ১৯১৯), পৃঃ ১-১১২, চিত্র ১-১০।

ভট্টাচার্য, বি. — বুদ্ধিষ্ট আইকনোগ্রাফী (অক্স্ফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯২৪), পৃঃ ১-২২০, চিত্র ১-২৮৩।

ভট্টশালী, এন. কে. — আইকনোগ্রাফী অফ্ বুদ্ধিষ্ট্ অ্যাণ্ড ব্রাহ্মণিক্যাল স্কাল্প্চার্স ইন্ দি ঢাকা মিউজিয়াম (ঢাকা, ১৯২৯), পৃঃ ১-২৭৪, চিত্র ১-৭৯।

ব্লক, টি. — সাপ্লিমেণ্টারী ক্যাটলগ্ অফ্ দি আরকিওলজিক্যাল কালেক্শন্ অফ্ দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (কলিকাতা, ১৯১১), পৃঃ ১-৯৬।

বূহ্লার, জি. — ইণ্ডিশেন্ পেলিওগ্রাফী গ্রূন্ডিস্ ডার্ ইণ্ডোআরিশে ফিললজি উণ্ড্ অলটারটুম্ স্কুন্ডে, ১৭টি চিত্রযুক্ত, (স্ট্রাস্বুর্গ, ১৮৯৬)। ফ্লীট্ কর্তৃক অনুদিত, সাপ্লিমেণ্ট টু ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারী, ৩৩ সংখ্যা (বোম্বাই, ১৯০৪), পৃঃ ১-১০২।

চন্দ, আর. পি. — ১। দি বিগিনিঙ্গ্স্ অফ্ আর্ট ইন্ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি

স্কাল্‌প্‌চারস ইন্‌ দি ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়াম, ক্যালকাটা, মেময়ার্স অফ্‌ দি আরকিও-লজিক্যাল সার্ভে অফ্‌ ইণ্ডিয়া, ৩০ নং (কলিকাতা, ১৯২৭), পৃঃ ১-৫৪, চিত্র ১-৭।

২। এক্‌স্‌প্লোরেশন্‌ ইন্‌ উড়িষ্যা, মেময়ার্স অফ্‌ দি আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্‌ ইণ্ডিয়া, ৪০ নং (কলিকাতা, ১৯৩০), পৃঃ ১-২৭, চিত্র ১-৯।

চক্রবর্তী, এস্‌. এন.

১। ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফ্‌ বেঙ্গলী অ্যাল্‌ফাবেট, জার্নাল অফ্‌ দি রয়্যাল এশিয়াটিক্‌ সোসাইটি. বেঙ্গল্‌ (কলিকাতা, ১৯৩৮), পৃঃ ৩৫১-৩৯১, ১০টি লিপিচিত্র।

:

২। অ্যান্‌ আউটলাইন অফ্‌ ষ্টোন্‌ এজ্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া, জার্নাল অফ্‌ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল্‌, ১০ (কলিকাতা, ১৯৪৪), পৃঃ ৮১-৯৮।

কড্‌রিংটন, কে. ড্য. বি.

এনশেণ্ট্‌ ইণ্ডিয়া—ফ্রম দি আরলিয়েষ্ট টাইম্‌স্‌ টু দি গুপ্তজ্‌ উইথ নোটস্‌ অন্‌ দি আর্কিটেক্‌চার অ্যাণ্ড স্কাল্‌প্‌চার অফ্‌ দি মিডিয়েভাল্‌ পিরীয়ড্‌ (লণ্ডন, ১৯২৬), পৃঃ ১-৬৫, চিত্র ১-৭৬।

কগিনব্রাউন্, জে. — ক্যাটালগ্ অফ্ প্রিহিষ্টরিক অ্যান্টিকুইটিস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম (সিমলা, ১৯১৭), পৃঃ ১-১৫৫, চিত্র ১-১০।

কুমারস্বামী, এ. কে. — ১। এ হিস্ট্রী অফ্ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ান্ আর্ট (লণ্ডন, ১৯২৭), পৃঃ ১-২৯৫, চিত্র ১-১২৮।

২। ল স্কুল্পচুর্ ত্ব বোধগয়া, আরস্ আশিয়াতিকা, ১৮ নং (প্যারিস, ১৯৩৫), পৃঃ ১-৭২, চিত্র ১-৬০।

৩। যক্ষস্, দুই খণ্ড (স্মিথ্সোনিয়ান ইন্স্টিটিউট্, ওয়াশিংটন্, ১৯২৮ ও ১৯৩১), পৃঃ ১-৪৩, চিত্র ১-২৩ এবং পৃঃ ১-৮৪, চিত্র ১-৫০।

কানিংহাম্, এ. — ১। স্তূপ অফ্ ভারহুত (লণ্ডন, ১৮৭৯), পৃঃ ১-৪৩, চিত্র ১-৫৭।

২। আর্কিওলজিক্যাল্ সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া রিপোর্ট্স্, সংখ্যা ১-২৩ (সিমলা কলিকাতা, ১৮৭১-১৮৮৫)।

ডেভিড্স্ রীস্, টি. ডব্ল্যু. — বুড্ঢিস্ট্ ইণ্ডিয়া, স্টোরী অফ্ দি নেশন্স্ সিরিজ্ (লণ্ডন, ১৯০৩), পৃঃ ১-৩৩২, ৫৭টি চিত্র।

ডি টেরা, এইচ. এবং প্যাটার্স ন্, টি. টি. — স্টাডিজ্ ইন্ দি আইস্ এজ্ ইন্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড্ অ্যাসোসিয়েটেড্ হিউম্যান্ কাল্চার্ (ওয়াশিংটন্, ১৯৩৯), পৃঃ ১-৩৫৪, চিত্র ১-৫৬ এবং ১৯৩টি 'গ্রন্থ চিত্র'।

দীক্ষিত, কে. এন্. — এক্স্ক্যাভেশন্ অ্যাট্ পাহাড়পুর, মেময়ার্স্ অফ্ দি আরকিওলজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, ৫৫ নং (দিল্লী, ১৯৩৮), পৃঃ ১-৯৯, চিত্র ১-৬৮।

ডিমাণ্ড্, এম্. এস্. — এ হ্যাণ্ড্বুক্ অফ্ মহমেডান্ ডেকরেটিভ্ আর্ট্স্ (নিউইয়র্ক, ১৯৩০), পৃঃ ১-২৮৭।

এপিগ্রাফিয়া বার্মানিকা — সংখ্যা ১-৪ (রেঙ্গুন, ১৯১৯-১৯২১)।

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা — সংখ্যা ১-১৫, রেকর্ড্ অফ্ দি আরকিওলজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া (কলিকাতা, ১৮৯২-১৯৪১)।

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডো-মোস্লেমিকা (কলিকাতা, ১৯০৭-১৯৪০)।

এপিগ্রাফিয়া জিলানিকা — সংখ্যা ১-৩, আরকিওলজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ সিলোন্ (অক্স্ফোর্ড, ১৯০৪-১৯৩২)।

ফুট্, আর. বি. — ১। দি ফুট্ কালেক্শান্ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্রি-হিস্টরিক্ অ্যাণ্ড্ প্রোটোহিস্টরিক্ অ্যান্টিকুইটিজ্ ঃ নোট্স্ অন দেয়ার

এজেস্ অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন্ (মাদ্রাজ, ১৯১৬), পৃঃ ১-২৪৬, চিত্র ১-৬৪।
২। ক্যাটালগ্ রাইসন্ (মাদ্রাজ, ১৯১৪), পৃঃ ১-২৬২।

ফুশে, এ. — ১। বিগিনিঙ্গ্স্ অফ্ বুড্‌ঢিষ্ট্ আর্ট অ্যাণ্ড আদার্ এসেজ্। টমাস্ কর্তৃক অনূদিত (প্যারিস, ১৯২৭), পৃঃ ১-৩১৬, চিত্র ১-৫০।

২। ল'আর্ত্ গ্রেকো-বুদ্ধিক্ দু গাঁধার, ১ম ও ২য় খণ্ড (প্যারিস, ১৯০৫ এবং ১৯১৮), পৃঃ ১-৬২৬, চিত্র ১-৩০০, এবং ১-৪০০, চিত্র ৩০১-৪৭৫।

ফ্রাঙ্ক, এ. এইচ্. — দি টিবেটান্ আল্‌ফাবেট্, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১১ (কলিকাতা, ১৯১২), পৃঃ ২৬৬-২৭২, চিত্র ১-৭।

ফ্রেঞ্চ, জে. সি. — দি আর্ট্ অফ্ দি পাল এম্পায়ার্ অফ্ বেঙ্গল (অক্স্‌ফোর্ড, ১৯২৮), পৃঃ ১-২৬, চিত্র ১-৩২।

গোপীনাথ রাও, টি. এ. — সাম্ চোলো ইন্‌স্ক্রিপ্‌শন্‌স্, তামিল গ্রন্থ-লিপির বিবর্তন সম্পর্কিত একটি অধ্যায় সহ, ট্রাভাঙ্কোর, আর্কিওলজিক্যাল্ সিরিজ, ১

(মাদ্রাজ, ১৯১০-'১৩), পৃঃ ২০১-২৫০, এবং চিত্র।

জাতক — সূচী সংখ্যা সহ ছয়টি সংখ্যা। ফউস্‌বল্‌ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ই. বি. কাওবেল ও অন্যান্যদের দ্বারা অনূদিত (কেম্ব্রিজ, ১৮৯৫-১৯১৩)।

ক্রামরিশ, এস. — ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চার, হেরিটেজ্‌ অফ ইণ্ডিয়া সিরিজ (অক্‌স্‌ফোর্ড, ১৯৩৩), পৃঃ ১-২৪০, চিত্র ১-৫০।

কৃষ্ণস্বামী, ভি. ডি. — স্টোন্‌ এজ্‌ ইণ্ডিয়া, এনশেণ্ট্‌ ইণ্ডিয়া, সংখ্যা ৩ (দিল্লী, ১৯৪৭), পৃঃ ১১-৫৭, চিত্র ১৩-১৪ এবং ৮টি গ্রন্থ চিত্র।

লুডার্স, এইচ. — এ লিস্‌ট্‌ অফ্‌ ব্রাহ্মী ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌স্‌ ফ্রম্‌ দি আর্‌লিয়েস্ট্‌ টাইম্‌স্‌ টু অ্যাবাউট্‌ এ. ডি. ৪০০, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১০ (কলিকাতা, ১৯১২), পৃঃ ১-১২৬।

মজুমদার, এন্‌. জি. — ১। গাইড্‌ টু দি স্কাল্‌পচার্‌স্‌ ইন্‌ দি ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ম্‌, প্রথম খণ্ড, আর্লি স্কুল্‌স্‌ (দিল্লী, ১৯৩৭), পৃঃ ১-১০৬, চিত্র ১-১১ এবং সম্মুখ-চিত্র ; দ্বিতীয় খণ্ড, দি গ্রেকো-বুড্‌ডিস্ট্‌ স্কুল্‌ অফ

গান্ধার (দিল্লী, ১৯৩৭), পৃঃ ১-৩৭, চিত্র ১-১৪, সম্মুখ চিত্র ও একটি মানচিত্র।

২। এক্স্প্লোরেশন্ ইন্ সিন্ধ, মেময়ার্স অফ্ দি আরকিওলজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, সংখ্যা ৪৮ (দিল্লী, ১৯৩৪), পৃঃ ১-১৭২, চিত্র ১-৪৬।

মজুমদার, আর্. সি. — লা পেলিওগ্রাফী দে ইন্স্ক্রিপসিওঁ দ্যু চম্পা, বুলেতিন্ দ্য ল'একোল্ ফ্রাঁসে দ'এক্স্ত্রিম-ওরিয়েন্ত, ৩২ (হ্যানয়, ১৯৩২), পৃঃ ১২৭-১৩৯ এবং চিত্র।

মার্শাল, জে. — ১। মহেন্জোদারো অ্যাণ্ড্ দি ইনডাস্ সিভিলিজেশন্, ৩ খণ্ড (লণ্ডন, ১৯৩১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-৩৬৪, চিত্র ১-১৪ ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫-৭১৬ ; ৩য় খণ্ড, চিত্র ১৫-১৬৪।

২। এ গাইড্ টু ট্যাক্সিলা (দিল্লী, ১৯৩৬), পৃঃ ১-১৫৪, চিত্র ১-২৫ এবং একটি মানচিত্র।

৩। এক্স্ক্যাভেশন্স্ অ্যাট্ ট্যাক্সিলা, মেময়ার্স অফ দি আর্কিওলজিক্যাল্

সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, ৭নং (কলিকাতা, ১৯২১), পৃঃ ১-৭৫, চিত্র ১-২৯।

মার্শাল্, জে. অ্যাণ্ড ফুশে, এ. — দি মনুমেণ্ট্স্ অফ সাঁচী, তিন খণ্ড (ভূপাল রাজ্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-৩৯৫; ২য় খণ্ড, চিত্র ১-৭০; ৩য় খণ্ড, চিত্র ৭১-১৪১।

ওঝা, জি. এইচ্. — ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা, দি পেলিও-গ্রাফী অফ্ ইণ্ডিয়া, ২য় সং (আজমীর, ১৯১৮), পৃঃ ১-১৯৯, চিত্র ১-৮৪।

পোপ্, এ. ইউ. — অ্যান্ ইন্ট্রোডাক্শন্ টু পারশিয়ান্ আর্ট—সিন্স্ দি সেভেন্থ্ সেঞ্চুরী এ. ডি. (লণ্ডন, ১৯৩০), পৃঃ ১-২৫৬, চিত্র ১-১০৩।

র‍্যাপ্সন্, ই. জে. — কয়েন্স্ অফ্ দি অন্ধ্র ডাইনেস্টী, দি ওয়েস্টার্ণ ক্ষাত্রপজ, দি ত্রৈকূটক্ অ্যাণ্ড দি বোধি ডাইনেস্টী (লণ্ডন, ১৯০৮), পৃঃ ১-২৬৮, চিত্র ১-২১।

রাইস, বি. এল. — মাইশোর অ্যাণ্ড্ কুর্গ্ ফ্রম্ ইন্স্ক্রিপ্শন্স্ (লণ্ডন, ১৯০৯), পৃঃ ১-২৩৮, চিত্র ১-১৫।

শিবরামমূর্তি, সি.	১। অমরাবতী স্কাল্‌প্‌চারস্‌ ইন্‌ দি ম্যাড্রাস্‌ গভর্ণমেণ্ট্‌ মিউজিয়ম্‌, বুলেটিন্‌, ম্যাড্রাস্‌ গভঃ মিউজিয়ম্‌ (মাদ্রাজ, ১৯৪২), পৃঃ ১-৩৭৬, চিত্র ১-৬৫ এবং গ্রন্থ চিত্র।
	২। ইণ্ডিয়ান্‌ এপিগ্রাফী অ্যাণ্ড্‌ সাউথ্‌ ইণ্ডিয়ান স্ক্রীপ্‌ট্‌স্‌, বুলেটিন, ম্যাড্রাস্‌ গভঃ মিউজিয়ম্‌ (মাদ্রাজ, ১৯৫২), পৃঃ ১-২৮০, চিত্র ১-১২ এবং গ্রন্থ চিত্র।
	৩। জিওগ্রাফিক্যাল্‌ অ্যাণ্ড্‌ ক্রোনোলজিক্যাল্‌ ফ্যাক্‌টরস্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ আইকনোগ্রাফী, এন্‌শেণ্ট্‌ ইণ্ডিয়া, সংখ্যা ৬, (দিল্লী, ১৯৫২), পৃঃ ২১-৬৩, চিত্র ২-২৮ এবং ৪০টি গ্রন্থ চিত্র।
স্মিথ, ভি. এ.	১। হিস্‌ট্রী অফ্‌ ফাইন আর্ট ইন্‌ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড্‌ সিলোন্‌ (অক্‌স্‌ফোর্ড, ১৯৩০), পৃঃ ১-২৩৬, চিত্র ১-১৬৫ এবং ১৪টি গ্রন্থ-চিত্র।
	২। ক্যাটালগ্‌ অফ্‌ কয়েন্‌স্‌ ইন্‌ দি ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ম্‌, ক্যালকাটা, ইন্‌ক্লুডিং দি ক্যাবিনেট্‌ অফ্‌ দি এশিয়াটিক্‌

সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড (অক্স্‌-ফোর্ড, ১৯০৬), পৃঃ ১-৩৪৬, চিত্র ১-৩১।

সুব্রাহ্মণ্য আয়ার, কে. ভি. দি পাণ্ড্য কান্ট্রি অ্যাণ্ড্ দি ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌স্, প্রসিডিংস্ এণ্ড্ ট্রানজ্যাক্‌শন্‌স্ অফ্ দি থার্ড ওরিয়েন্টাল্ কন্‌ফারেন্‌স্ ১৯২৪।

সুব্রাহ্মন্যান, টি. এন. পাণ্ডাই তামিল এড়ুথুগাল (আর্লি তামিল স্ক্রীপ্‌ট্‌স্) তামিল ভাষায় লিখিত (মাদ্রাজ, ১৯৩৮), পৃঃ ১-১১২, চিত্র ১-৭ ও লিপি-চিত্র।

ভোগেল্, জে. পিএইচ্. ১। লা স্কুলপ্‌তুর্ দ্য মথুরা, আর্‌স্ আশিয়াতিকা, ১৫ (প্যারিস্, ১৯৩০), পৃঃ ১-১৩১, চিত্র ১-৬০।

২। দি আরলিয়েস্‌ট্ স্যান্‌স্‌ক্রিট্ ইন্‌স্‌ক্রিপশন্‌স্ অফ্ জাভা, পাব্‌লিকেটিজ্ ভ্যান্ দেন্ আউধাকুনদিজেন্ দিয়েন্‌স্‌ট্ ইন্ নেদারল্যাণ্ডশ্-ইণ্ডিজ, ১ম খণ্ড (১৯২৫), পৃঃ ১৫-৩৫।

———